প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৫৯

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩
মুদ্রাকর : ইম্প্রেসন কনসালট্যাণ্ট
৩২/ই জয়মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৫

উৎসর্গ

অগ্রজ কবি-অনুবাদক
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
শতবার্ষিকী স্মরণে

ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি

অক্টোবর বিপ্লবের দুবছর আগে ১৯১৫ সালে ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি 'War and peace' কবিতায় লিখেছিলেন, অবশ্যই বিপ্লবের নেতা লেনিনকে উদ্দেশ্য করে—"And he, the free man of whom I'm yelling—he'll come believe me, believe, he will."—

উন্নত পর্বতশ্রেণী আশ্রিত জর্জিয়ার একটি গাঁয়ে শৈশব কাটে মায়াকোভস্কির। কুটাইসির স্কুলে পড়াশুনা করার সময়েই ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবের জোয়ারে তিনি ভেসে যান এবং বিপ্লবের কাগজ স্কুলের ডেসকে লুকিয়ে রেখে বিলি করতে থাকেন। এবং পরবর্তী তিন বছর বিপ্লবের কাজে ভয়ংকরভাবে জড়িয়ে পড়েন, কারাবরণ করতে হয় বারবার। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি মস্কো স্কুল অব পেইন্টিং-এ যোগ দেন। তার আগেই অবশ্য কবিতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। কবি ততদিনে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন যে সোসালিস্ট আর্ট করবেন। যদিও ছবি আঁকার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল তবুও ক্রমশ ছবির বদলে আরো বেশী করে কবিতার মধ্যে মগ্ন হয়ে যেতে থাকেন মায়াকোভস্কি। ১৯১৫ সালেই বিপ্লববিষয়ে তিনি বিখ্যাত কবিতা 'Clouds in trousers' গোর্কিকে পড়ে শোনান। গোর্কি মায়াকোভস্কির আবেগ ও উদ্দাম বিপ্লব-সচেতনতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। ১৯১৩ সালে তাঁর নিজস্ব লেখায় যে মহান কবির উপস্থিতির প্রয়োজনের কথা তিনি লিখেছিলেন সেই রকমের একজন মহৎ কবির সম্ভাবনা তিনি মায়াকোভস্কির মধ্যে হয়ত দেখতে পেয়েছিলেন। এবং গোর্কি ঠিকই ভেবেছিলেন। কারণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কবি সমস্ত বিপ্লব বাহিনীর প্রিয় এবং তাঁদের নিজেদের কবির সম্মান লাভ করেন। ১৯১৯-২০ সালে মায়াকোভস্কি টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করেন এবং ওই সময়েই প্রিয়তমা নারীর সঙ্গে বিচ্ছেদে মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে লেখেন "It" কবিতাটি। 'Clouds in trousers'-এ মায়াকোভস্কি লিখেছিলেন—"down with your Love" যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি "It"-এ পরিবর্তিত রূপ পায়—"down with your system"। ঠিক এইরকম সময়েই সামাজিক পরিবেশে লাল নিশানের প্রভাব ব্যক্তিজীবনেও দ্রুত বিস্তারলাভ করতে থাকে এবং তিনি লেখেন "Confiscate, abrogate my suffering"—কিন্তু লক্ষ্য করেন আবহমান কালের দাসত্বের

অভ্যাস বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেই—"Slavehood that ages had hammered into our souls", এক ধাক্কায় যেগুলো কোনদিনই যাবার নয়। নয়। ১৯২৩ সালে ব্যর্থ প্রেমের আঘাতে জর্জরিত কবি কিছু সময় মাত্র একাকী নিজেকে ছোট্ট ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখেন। অতঃপর আবারও বিপ্লবাত্মক কবিতা এবং কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ব্যক্তিজীবনের হতাশা, ব্যর্থতা দূরে ঠেলে তিনি সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে আত্মমগ্ন হন। সাত বছর পরে ১৯৩০ সালে তাঁর সেই ছোট্ট ঘরটিতে আত্মহত্যা করেন কবি। নিজেকে গুলি করার আগে স্বহস্তে বিদায়পত্রটি লিখে যান—জীবন থেকে সরে এলাম—আর প্রয়োজন কি অভিযোগ, যন্ত্রণা, অসুবিধার—আমাদের পরস্পরের—কবির সারাটি জীবনই ছিল কবিতা। জীবন এবং মৃত্যুও।

সিদ্ধেশ্বর সেন মায়াকোভস্কি অনুবাদে হাত দেন সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই। তখনই "ট্রাউজার পরা মেঘ", পরে আরও। ষাটের শেষ দিকে "ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।" এটি প্রকাশ পেলে, লেনিন-শতবর্ষের আগে, লেনিনগ্রাদের শ্রীযুক্ত ইউরি ফ্রলভ, বহু ভাষাবিদ, বাংলা ভাষাবিদও, বাংলায় এই কাব্যের তর্জমা পেয়ে আলোচনা ছাপালেন মস্কোর "লিতেরাতুরনাইয়া গাজেতা" সাহিত্য সাময়িকীতে। সে সময় কলকাতায় ছিলেন রুশী অধ্যাপিকা শ্রীমতী লিজিয়া ওব্যারিয়ুস।

এবার, শক্তি চট্টোপাধ্যায় যখন স্থির করেন, দে'জ-এর সৌজন্যে মায়াকোভস্কির এই কবিতা-সংগ্রহের ব্যাপারে, তখন এ-বইয়ের জন্যে কয়েকটি নতুন অনুবাদও সিদ্ধেশ্বর সেন যোগ করেন।

সূচি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সিদ্ধেশ্বর সেন

মুকুল গুহ

আমার সোভিয়েত পাশপোর্ট

আমলাতন্ত্রকে ছিঁড়ে
কুটি কুটি করি আমি
নেকড়ের মতন।
বাধা-নিষেধের প্রতি
শ্রদ্ধার কথা বলছো? কচু আছে।
শয়তানের প্রতি
আমার মায়া-মমতাহীন ছেঁটে ফেলা ধাত—
লাল ফিতে বাঁধা প্রতিটা কাগজপত্তর।
কিন্তু এটা…
লম্বা করিডোর ধরে
ক্যুপ আর কেবিনের মধ্যে
সারিবদ্ধ নরম নরম ভাবের কর্মচারীরা।
তারা পাশপোর্টগুলো নিচ্ছে, জড়ো করছে
তার ফাঁকেই আমি
আমার সিঁদুরে বেঁটে বইটা এগিয়ে দিই।

একজাতের পাশপোর্ট
হাসিমাখা ঠোঁট ফাঁক করায়,
অন্যগুলো
চোখে-মুখে পাথর টেনে আনে।
ওরা নেয়,
ধরা যাক, বেশ শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গেই
পাশপোর্টটি
যখন সেটা কোনও
ইংরেজ লায়োনেলের ঘুম-গাড়ি থেকে আসে।
লোকটার চোখগুলো
যেন পিছলে পিছলে যাচ্ছে

যখন
সে নুয়ে পড়ছে সম্ভ্রমে
মানুষ, মোটামুটি, যতোটা নুয়ে পড়তে পারে ঠিক ততোটাই
এমনভাবে পাশপোর্টটি হাতে নিচ্ছে
যেন ঘুষ
যদি লোকটি আমেরিকান হয়, তাহলেই।
পোলাণ্ডের লোকটির ক্ষেত্রে
ওরা এমন হাঁদা ভোঁদার মতন
তাকিয়ে থাকে,
হাতির মতন মোটা পুলিশী প্রশ্ন —
নিবাস কোথা,
আর এই কাগজপত্তরগুলোই বা কী
ভূগোলের নয়া পুঁথি ?
আর না ঘুরিয়েই
তাদের বাঁধাকপিমার্কা মুণ্ডু,
তাদের ভাবনা চিন্তাগুলো
শরীরের নিম্নাঙ্গে লুকোনো,
তারা না চোখ কচলেই
সুইডিশ আর নরওয়ের
বুড়োগুলোর কাছ থেকে
তাদের পাশপোর্টগুলো হাতে নেয়
তারপর হঠাৎই
যেন তাদের গালের ভেতরে
ভূমিকম্প হচ্ছে
সেভাবে সেইসব ভদ্দরলোক প্রায়
কঁকিয়ে ওঠে
ঐসব খুব বেশি কেতাদুরস্ত ভদ্দরলোক
হাতে নেয়
আমার ঐ সিঁদুরে চামড়ার পাশপোর্ট
তারা হাতে নেয় —

যেন বোমা
হাতে নেয় — যেন একটা মেঠো ইঁদুর.
ক্ষুরের মতন
দুমুখেই যার ধার,
হাতে নেয়
র‍্যাটল সাপের মতন
বেজায় বড়সড় আর লম্বাটে
অন্তত বিশ থলি বিষে ভরা।
মুটেটার চোখ অর্থবহ চকচকিয়ে ওঠে
(আমি আপনার মোট বয়ে নিয়ে যাবো,
যৎসামান্য পয়সায়,
বাবুসায়েব····)
ভদ্রমণ্ডলী খুব খুঁটিয়ে
দেখে ঐ মুটেটার দিকে,
আর মুটেটাও ভদ্রমণ্ডলীর দিকে।
কী আহ্লাদে
ঐ ভদ্দরলোকের জাত
আমায় পাবে
দড়ি বাঁধা আর চাবকে লাল করা
কেননা আমি ধরে আছি
আমার হাতে,
হাতুড়ি পেটানো হাতে
কাঁকড়ার মতো
আমার লাল সোভিয়েত পাশপোর্ট।
আমি নেকড়ের মতন হিংস্র নখে
ব্যুরোক্রেসী
ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলি।
নিষেধনামার প্রতি
আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ভক্তি নেই।
শয়তানের প্রতি

আমি নিষ্ঠুর আর নির্দয়
আমি তাকে রেয়াত করবো না,
লাল ফিতে জড়ানো কাগজের প্রতি
ঘেন্না আমার।
কিন্তু, এইটা....
আমি বের করি
আমারি বড়োমাপের ট্রাউজারের
পকেট থেকে
দাম নেই এমন মালের
একটি প্রত্যয়িত নকল।
তুমি এখন
এটা পড়ো
আর হিংসে করো
আমি সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের
এক নাগরিক!

একটি অদ্ভুত রহস্যময় অভিযান [১৯২০]

[কী যে আমার হয়েছিলো, ও ভ্লাদিমির মায়োকোভস্কি, রুমানায়ানতসেভে,
মাউণ্ট আকুলায় — ইয়ারোস্লাভ রেলের সেই পুস্কিনোয়।]

সূর্যাস্ত ওই, অন্তত শ খানেক সূর্যের দিকে বন্দুক তুলেছিলো
আর গ্রীষ্মকাল জুলাই-এ অবসিত
গরমের বিস্তার এবং ঝাঁকানি
আকাশকে বিপর্যস্ত করেছে —
এবং এই সময়ে, এই দেশে, এইটাই একটা' ঘটনা, ঘটনামাত্র।

মাউণ্ট আকুলা নামের সেই পাহাড়টি,
পিঠে কুঁজো আর বেশ উঁচু মতন
পুশকিনোর কুঁড়ে আর ঘোরাফেরা বারান্দা ঠিকই রেখেছে।
গ্রামের গাছের ছালের চাল মুড়েছে
পাহাড় আর গরমে সন্নত।
এখন, গাঁ থেকে বেশ দূরে
একটি গর্ত তার জন্যে হাঁপাচ্ছে
আর প্রতিদিনই
সূর্য সেই গর্তে পড়ে
আস্তে ধীরে, খুবই সাবাস্ত
সূর্য, পরের দিনের উজ্জ্বল মাথায়···
জানি, কী না জানি যে ওঠাবেই মাথা
যেন লাল
যেন চিরকাল, যেন সে রকম ভাবে।
আর, এভাবে প্রত্যেকটি দিনই যায়····
সে কারণে ব্যথা, তাই
বিরক্ত আমিও
আমাকে পাগল করে, কাল যেন
কী হতেও পারে।

তৎক্ষণাৎ, ওর প্রতি বিরক্ত হয়েও
আমিই সূর্যের প্রতি কটুকথা বলি :
—'নামো, নেমে এসো ওহে।
ভুলে যাও তোমার ও লাঞ্ছনাসম্পৃক্ত কোটর
ভুলে যাও।'
আমি ও-ভাবেই তাকে বলাৎকার করি
সূর্যের প্রত্যক্ষ দিকে—কে তুমি ? বলে
ওরাও তোমার পিছু লাগে—
তোমার পশম আছে, মেঘের নিশ্চিত কাছাকাছি
এখানে রয়েছি আমি, জানিনা বসন্ত কিনা শীত
পোস্টার-ফেস্টুন তৈরি করি শুধু, তৈরি করি শুধু।
চিৎকার করে আমি সূর্যকে জানাই, তুমি থামো
তুমি শুধু থেমে থাকো, গর্জন করো না
আমার একথা শোনো, ও তুমি তামার মতো চোখ,
বিন্যস্ত করার আগে, কাছে এসো—চিৎকার করে বলি
বরং আমার সঙ্গে চা খাও, পেয়ালার অধিক
খাও চা।

কী আমি করেছি ?
এখন, ভাবছো মনে, আমি দূরগত।
কী করেছি আমি ?
এখানে সূর্যও উঠে পড়ে,
রশ্মিমালা অতি বড়ো আক্রমণপ্রিয়,
নেমে আসে ভূমি ছুঁয়ে আমার পিছনে।
ভাণ করে, মনে হয়, ভয় নেই কোনও
আমি চলে যাই।
তার চোখ বাগানে রয়েছে।
জানলা ভরে দিয়ে
এবং দরোজা আর ফুটোফাটাগুলি
মোটা ও পৃথুল রোদ কাছে চলে আসে

এভাবেই, চলে আসে, শ্বাস নিয়ে, বলতে বলতে কথা
গাঢ়স্বর : আমি তো তোমার জন্যে আগুন নিয়েছি
সেইদিন থেকে, তুমি আমন্ত্রণ করেছিলে, ঠিকই !
তবে, কফি, চা খাও আর
ভুলেও যেও না দিয়েছি তো জ্যাম !
গরমে ঠিক গরমেও নয় আমার কান্না পাচ্ছিলো, হচ্ছিলো
শ্বাসকষ্ট
তবু আমি একটা সোয়েটার পেয়েছিলাম ।
'আচ্ছা শোনো, বোসো
পরিচ্ছন্ন কমরেড, বোসো তুমি !'
মনে হলো, কোনো শয়তান আমাকে
সূর্যের প্রতি চেঁচাতে বলেছে ।
আমার নিভে যাবার সময় এখন
আমি নিভেও গেছি—
চেয়ারের কোথায় আছি বসে :
ভয় পাচ্ছি, পরে কী ঘটবে, এই ভেবে ।
কিন্তু, সূর্য থেকে একধরনের আলো বেরুলো—
মনে হলো না, ততো বিরক্ত—
আর আমি, নিজের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে,
নিরুপদ্রব
বসে থাকলুম—
উজ্জ্বলতার সঙ্গে কথা বলতে থাকলুম !
আমি কথা বলি
এ-ব্যাপারে
ও-ব্যাপারে
আর শিগগীরই
খোলা মনে ওর পিঠ
চাপড়ে দোবো ।
আর সূর্য বলবে : তোমরা ভুলে যেও না—
তোমরা পরস্পরের জুড়ি, বন্ধুও বটে ।

চলো যাই !
কবি, গাও দেখি
আর আমি চেঁচাই — ওদের ভয় দেখাই
ওরা, মানে ওই পৃথিবীর যতো ওবড়া-জোবড়া,
ওদেরকে, ভয় দেখাই —
আমি আলো ঢেলে দেবো
তুমিও অন্যায় কিছু করবে না —
তুমি সরাসরি পদ্যই লিখবে।'
সূর্য, তারপর, তার হাতের শিথিল তীরন্দাজে
বললো, ছেড়ে দাও, দাও, রাত্রির নির্ভর অগোছালো
— চলে গেলো কালো সবই বিলিয়ে তারার সর্বনাশ।
রশ্মি ও ভাষা — বর্ণমালা, তবে, তোমার
সমস্ত কিছু হবে !
তারপর, অকস্মাৎ সূর্য হলো অত্যন্ত কাতর,
এবং রাত্রির মতো ক্লান্ত, শুধু বিছানাই চায় —
হঠাৎ আমার প্রতি অগ্নি, 'শুধু মনে রেখো'
এই কথা বলে, প্রায়, যায় আবার সামলাতে।
চিরকাল আলো দিতে,
আলো দিতে সর্বজনময়
আর জ্বলে-পুড়ে মরতে
আছি আমি
আছে মৃত্যুঞ্জয়।
সূর্য

জন্মজয়ন্তী

[পুশকিনের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত]

আলেকজাণ্ডার সার্গেইয়েভিচ
এই আমিই হলুম অধম সেই মায়াকোভ্‌স্কি ;
তোমার হাত দাও,
ঠিক আমার বুকের ওপরে,
শোনো—
হৃদয়ের ধুকপুকুনি নয়, শুধুই গর্জন আর হুংকার।
এই ছোট্ট নাজুক সিংহের বাচ্চা
আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না,
কখনও জানতুম না
এতোখানি ভার
অন্তত হাজার হাজার টনের
আমার
লজ্জাজনক হালকা মাথার মধ্যে আছে।
আমি তোমায় নামিয়ে আনবোই।
আমার কড়া ধাতে আশ্চর্য হচ্ছো ?
বিব্রত হচ্ছো ?
ব্যথাতুর ?
ক্ষমা করো,
ও প্রাচীন।
আমি পেয়েছি—
হ্যাঁ, তুমিও পেয়েছো নিশ্চিত
অনন্তের সংরক্ষিত স্বাদ।
আমাদের কাছে এক ঘণ্টা হারিয়ে গেলেই বা ক্ষতি কী ?
যেন জলে সাঁতার কাটতে-কাটতে
আর কথা কইতে-কইতে এগিয়ে যাচ্ছি।
মুক্ত
আর শৃঙ্খলহীন—

যেন বসন্তকালই !

দ্যাখো,

'ওই যৌবনবতী চাঁদের সুষমা

কী বেদনাময়,

তাকে একা

রেখে যাওয়াও

খুব বিপজ্জনক !

প্রেম ভালোবাসা

আর পাঁচিলচিত্র থেকে

আমি এখন ছাড়া পেয়েছি ।

হিংসাদ্বেষের নখী ভাল্লুক

আজ লিকলিকে, প্রায় মরতে বসেছে

কিন্তু, পৃথিবী এখনও ঘোরে—

যদি তুমি এখন বিশ্বাস না করো,

বোসো

তোমার নিজের পাছা পেতে বোসো—

আর পিছলে যাও ।

না,

আমি বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় পড়বো না আর ।

এবং

আমি কথা বলতে চাই না—

কোনো মানুষের সঙ্গেও না ।

কেবলমাত্র

আমাদের মতন যারা

যাদের মধ্যে আছে ছন্দের নিঃশ্বাস

শুধু তাদেরই সঙ্গে

কাব্য বালুভূমি যাদের স্পন্দন-ভরপুর ।

খুব ক্ষতিকর মনে মনে কথা কওয়া,

স্বপ্ন দেখার কোনো দরকার নেই,

তবু, আমাদের যে যার ভূমিকা

রক্ষা করে যেতে হবে।

কখনও-সখনও কিন্তু,

জীবন

অন্য পথ ধরে,

আর, তা তো তুমি বেশ ভালো করেই বুঝেছো

আবোল-তাবোল গল্পের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে।

কবিতালতায়

আমরা বারবার

বেয়নেটের খোঁচা মেরেছি,

আর খুঁজেছি সেই সব বাক্যবন্ধ

যা ধারাল

ধন্দহীন।

কিন্তু, পদ্য ব্যাটা হলো

এক কুত্তীকা বাচ্চে, জবড়জং-কা-তবড়জং :

ওটা টিঁকে থাকবেই—

আর তুমি কিছুতেই ওর উপকার করতে পারবে না!

এক পাত্তর দাও!

জানি এটা খুবই ছেঁদো একটা ব্যাপার—

গলা পর্যন্ত

ভদ্‌কা

ঠাসো, সাপ্‌টে ধরবে—

তখন দ্যাখো

লাল আর শাদা স্টার-লাইন

বস্তা বস্তা

ভিসায় ডুবে গেছে।

আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পছন্দ করি—

মদ্যপান করতে দুজনে একসঙ্গে।

কেমন করে কাব্যলক্ষ্মী

নিঃশব্দচরণে এসে

তোমার জিহ্বায় পিঁড়ি পাতে।

আর ঠিক, কে যেন বলেছিলো—

তোমার ওলগা কী, ভাবছি—

না না,

টাটিয়ানার কাছে লেখা ওনেজিনের চিঠিতেই ছিলো।[1]

ঠিক এমনিভাবেই তো ?

'বলতে গেলে

তোমার স্বামী দেবতাটি একটি গর্দভই বটে,

অসহ্য, অসহ্য।

আমি তোমায় ভালোবাসি,

তুমি আমার, একান্তই আমার।

আমায় প্রতি ভোরে কথা দেবে

যাতে সেদিনই তোমার-আমার দেখা হয়।'

যা কিছুই ঘটবে পরে :

আর ঠিক জানলার নিচে আড়ি পেতে থাকবে,

একটি চিঠি—

হড়হড়ে একটিই কম্পন।

হায়

কিন্তু যখন একজন এমন কি দুঃখই করতে পারে না

যে, আলেকজাণ্ডার সার্গেইভিচ, বেশ কঠিন. সহজবোধ্য না।

কেমন আছো হে মায়াকোভ্স্কি !

দক্ষিণ দেশের বাতিস্তম্ভ।[2]

তোমার হৃদয়

যে-ছন্দ নিয়ে প্রাণপাত করছে

তা খুবই জবরদস্ত

আর এখন—

প্রেম ভালোবাসা শেষ সীমায় পৌঁছেছে,

১. এখানে মায়াকোভস্কি পুশকিনের বিখ্যাত কাব্য 'ইউজিন ওনেজিন' থেকে একটি অংশ গদ্যাকারে তুলে দিয়েছেন।

২. রুশ ভাষায় 'মায়াক' অর্থ 'বাতিস্তম্ভ বা আলোকস্তম্ভ'।

ও প্রিয় ভ্লাদিম ভ্লাদিমিচ ।[৩]
এই নামটি বুড়ো হতে জানে না
জানে না অবসর কাকে বলে !
আমার আগেই আমার মড়াকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ।
আমি দুটোকে একই সঙ্গে জব্দ করতে পারি
এবং আহ্লাদের সঙ্গে,
আর যদি খেপে যাই,
তাহলে তিনটেকেই এক সঙ্গে ।
ওরা বলে—
আমি নিজেই নাকি একটা অনন্য বিষয় ।
নতুন রকম রীতি
সেজন্যেই ছুরি কাঁচি চালানো বন্ধ,
আমি ব্যাপারটা তোমার কাছেই বিবেচনার জন্যে পাঠাচ্ছি,
ওরা বলে
ওরা দেখেছে

দুজন
প্রেমপীড়িত সদস্য ভি টি এস আই কে-এর ।[৪]
কার্যনির্বাহক কমিটির সংক্ষিপ্ত নাম ।
ওদের পিত্তি বের হতে দেওয়া
আরেক ধরনের অপযশ ।
তুমি শুনতে পাচ্ছো না, ওরা কী বলছে !
হয়তো
আমিই একা লোক
যে সত্যিই দুঃখিত
আলেকজাণ্ডার,
তমি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, জীবিতভাবে নেই ।

৩ মায়াকোভ্স্কির ক্রিশ্চান নাম ।
৪ রাশিয়ার সারা ইউনিয়ন কেন্দ্রীয়

আমি তোমার জীবিত তোমার সঙ্গে কথা কইতে কী যে কাঙাল আজ।
অবশ্য
শিগগির আমিও মারা যাবো
এবং তারপর বোবা পাথর।
মৃত্যুর পর আমরা দাঁড়াবো
প্রায় পাশাপাশি
তুমি 'পি' অক্ষরের নিচে
আর আমি
'এম' অক্ষরের।
কে আমাদের মধ্যিখানে ?
আর কাকে নেওয়া যায় ?
আমার দেশে কবির সংখ্যা খুবই কম
এটা স্বীকার করতেই হবে।
আমাদের মধ্যে — ক্ষমাঘেন্না করায়
নাডসন ঢুকে পড়েছে।[৫]
আমরা বলবো
যে তাকে সরিয়ে
কোনো 'জেড' এর কাছাকাছি দাঁড় করাতে।
ওখানেই তো নেক্রাসভ,[৬]
কোলিয়া,
তেমন মন্দ না
তাস খেলায়
বা পদ্য খেলায়
এবং বিশেষ করে দেখতেও সুন্দরপানা।

৫ এস জে নাডসন (১৮৬২-৮৭), বিষাদগ্রস্ত এই কবির কবিতা কবরখানার শ্রান্তিতে আচ্ছন্ন। খুবই নম্র লিরিকধর্মী কবিতা তাঁর।

৬ এন এ নেক্রাসভ্ (১৮২১-৭৭)। পুশকিন এবং লের্মন্তভের সঙ্গে একই সঙ্গে নাম করা যায়। তাঁর রচনা তরুণ রাশিয়াকে, অত্যাচারকে ঘৃণা করতে, একনায়কত্বকে বরখাস্ত করতে আর সাধারণকে বুঝতে

তুমি কি ওকে চেনো ?

বেশ ভালো মনের চাষার ছেলে একজন !

আমরা ওকে মোটামুটি ভালোই বলবো ।

আর সাম্প্রতিকঅলারা ?

বাছাই না করেই তাদের আধগ্রোস···

আমার চোয়াল

`হাই তোলার বদলে

হাঁ হয়ে থাকে —

রভভ[7]

ডোরোগয়চেনকো

কিরিলভ

জেরাসিমভ

আহা

কী বাতুল নিরবচ্ছিন্ন ভূচিত্র ।

এসেনিন ?[8]

কুকুর-দৌড়ে একটা ভাঁড়মাত্র, বিরক্তি আমাদের ।

হাস্যকর !

গরু একটা

খোঁয়াড়ে আবদ্ধ জীব ।

একবার তার পদ্য শোনো····

যেন সে বালালাইকা-বাজিয়ে !

একজন কবিকে

তার জীবনেরও পরভূ হতে হয় ।

আমরা খুবই শক্তপোক্ত,

পোলটাভা ভ্যাটের মদের মতন ।

৭ মায়াকোভ্‌স্কির সমসাময়িকেরা । আজ পরিত্যক্ত ।

৮ সার্গেই এসেনিন (১৮৯৫-১৯২৫) পুরনো গ্রাম্য কবিকুলের শেষ প্রতিনিধি। শহরের ক্যাবারে ও পানশালায় আপ্লুত থেকে গ্রামের নস্টালজিক স্মৃতিচারণই বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর ।

ঠিক আছে, আচ্ছা, কিন্তু বেজিমেনস্কির ব্যাপারটা কী ?[৯]

কী, আর মোটামুটি চলনসই

ততো খারাপ না···কফির মতন উত্তেজক।

আমাদের আছে

কলকা অ্যাসেইয়েভ[১০]

সত্যিসত্যিই

সে পারে।

তার কবজির জোর আছে

ঠিক আমারই মতন।

কিন্তু, দ্যাখো

কী কষ্ট করেই না তাকে চলতে হচ্ছে।

তার বউটি ছোটখাট,

কিন্তু, উপহার দিয়ে ফেলেছে একটা মোটা পরিবারকে

যদি তুমি টিঁকে যাও কোনোমতে

তাহলে এল ই এফের[১১] সহ-সম্পাদকের পদ বাঁধা।

আমি তোমার মতন

শক্তপোক্ত মানুষকেই

উত্তেজক পোস্টার লেখার দায়িত্ব চাপিয়ে নিশ্চিন্ত।

একবার দেখাও শুধু—

কীসের জন্যে, কেন তুমি ধরতে পারবে।

তুমি নিশ্চয় পারবে—

কেননা, তোমার লেখার হাতটি চমৎকার, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

তোমাকে একটা বুরুশ দেবো আমি

আর খরখরে কেমব্রিক,

৯ আলেকজাণ্ডার বেজিমেনস্কি। মায়াকোভ্স্কির পরবর্তী আসনটিই তাঁর ছিল একদা।

১০ কলকা অ্যাসেইয়েভ। মায়াকোভ্স্কির কবিবন্ধু। তিনি 'মায়াকোভ্স্কি আসছে' এই নামে জীবনীকাব্য রচনা করেছেন।

১১ এল ই এফ। এই পত্রিকাটি মায়াকোভ্স্কি সম্পাদনা করতেন।

আর তুমি আমাদের সোভিয়েত

মজুতভাঁড়ারের প্রচার চালিয়ে যাবে।

(পয়ারের তেড়াবেঁকা বর্ণমালা আমার চাই

তাহলেই তোমার

বড়িয়া শিষ্য বনে যাবো !)

তবে

আজ আর

পাগলা-পয়ারের দিন নয়।

এখন আমাদের কলমগুলো

বেয়নেট

আর দাঁতের পাটি

ইস্পাতকঠিন.

বিপ্লবের যুদ্ধবিগ্রহ

পোলটাভার[১২] থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ,

এখন ভালোবাসা

ওনেজিনের[১৩] ভালোবাসার চেয়েও

অনেক চিত্তহরা।

পুশকিনবাদীদের সাবধান,

ঘিলুহীন মাথা ওদের

পোকায় কাটা নোংরা

লেপ-তোষক তুলে ধরেই আছে।

'দ্যাখো ওদিকে,

পুশকিন এল ই এফে এসে

পৌঁচেছে।

নিগ্রো লোকটা !

১২. পোলটাভা। পুশকিন লিখিত মহাকাব্য 'পোলটাভা'—পিটার দি গ্রেট এই মহাযুদ্ধে সুইডেনের দ্বাদশ চার্লসকে হারান।

১৩. ওনেজিন। পুশকিনের কবিতায় লেখা উপন্যাসের নায়ক, ইউজিন ওনেজিন।

দেরজাভিনের[১৪] সঙ্গে প্রতিযোগিতা…

ন্যক্কারজনক !'

আমি ভালোবাসি তোমায়

না, মমির মত নয়,

অতিজীবিত বলেই।

ওরা তোমাকে ঝকঝকে-তকতকে করে তুলেছে

সংকলনের মোড়কে।

কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে বাজি রাখছি

জীবনে

সিসে-রঙে বেড়ে যাওয়া,

আর রাগে ফেটে পড়া,

আফ্রিকার জাতক !

ওই তথাকথিত সম্ভ্রান্ত মানহীন জানোয়ারটা,

ঐ কুত্তার বাচ্চা ডানথেসের[১৫] কথা মনে করো !

আমাদের উচিত ছিল ওটাকে শুধানো :

'তোর সমাজ কী রে ?'

আর '১৭-র আগে

বিরোধীদের দলের একজন হয়ে ভিড়েছিলি না ?'

আহা, যদি আমরা ডানথেসের রক্ত শুঁকতে পারতাম !

আচ্ছা, কী সব আজেবাজে বকে মরছি !

অলৌকিকতা হলো…

বলতে গেলে,

সম্মানের কেনা গোলাম…

একটা বুলেটের স্পর্শ পেল না…

১৪. দেরজাভিন। [১৭৪৩-১৮১৬] ধ্রুপদী রাজকবি, পুশকিনের পূর্বসূরী। তিনি তরুণ পুশকিনের কবিতা পাঠ শুনে, তাঁকে তাঁর উত্তরসূরী ঘোষণা করেন।

১৫. জনৈক ফন্দিবাজ, যে ডুয়েলে পুশকিনকে গভীরভাবে বুলেটবিদ্ধ করেছিল।

সাংঘাতিক ব্যাপার

আজ আর কমতি নেই

আমাদের বউদের পিছনে তাড়া করা সব রকম

শিকারীর সংখ্যার।

হ্যাঁ, ভালোই,

সোভিয়েতের দেশটায় ভালোই আছি।

তুমি বেঁচে থাকতে পারো,

সুখে কাজকর্ম বাস্তবিক করতেই পারো।

শুধু, একটা ব্যাপারই দুঃখের

এখানে কোনও কবি নেই—

যদিবা কেউ কেউ থেকে থাকে,

আছে হয়তো

তারা ঠিক তেমনটি নয়, যেমনটি আমরা চাই।

বেশ বেশ, সময় হয়েছে :

প্রত্যূষের কাঁটাভাঙা রোদ্দুর

এখন ঐ দূরের আকাশ খোঁচাচ্ছে।

নাগরিক যোদ্ধবাহিনীর তুখোড় সেনাদল

হয়ে-ওঠা চেয়ো না।

এখন আমরা তোমাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি

টিভারস্কায়া স্কোয়ারে[১৬] তুমি দাঁড়িয়ে আছো।

তাহলে, এসো এখন তোমাকে তোমার

পাদপীঠে বসিয়ে দিই।

পারম্পর্য বিচারে

এখন আমারও একটা জীবন্ত স্মারকস্তম্ভ পাওনা—

যাক সে কথা

আমি অবশ্য সেটাকে

১৬. এখন এর নাম পুশকিন স্কোয়ার। এর পাশেই মায়াকোভস্কি স্কোয়ার।

ডিনামাইট দেগে
উড়িয়ে দিয়েছি
আকাশের দিকে !

আমি ঘেন্না করি
যে কোনরকম মৃত্যুপ্রসঙ্গ ।
আমি পুজো করি
যে কোনরকমে বেঁচে-থাকা।

আমি

আমার মথিত আত্মার
ফুটপাতে
উন্মত্তের জুতোর গোড়ালি
রূঢ়, রুক্ষ শব্দের ছাপ ফেলে যায় ।

নগরী
যেখানে ঝোলে
মেঘের ফাঁস গলায়,
প্রাসাদ, মিনার
তাদের মোচড়ানো চুড়ো ঢেকে থাকে—
আমি যাই—
নিঃশব্দে, আমার চোখ ফেটে জল পড়ে

দেখি চৌমাথায়-চৌমাথায়
ক্রুশবিদ্ধ
প্রহরী ।

পারো তুমি ?

একটা পাত্র থেকে আমি ছিটিয়ে দিলাম রঙ,
আর ভোঁতা জগৎটা বেঁচে উঠল রঙিন আবেগে।
একটা পাত্রে জেলির দাগে আমি
সাগরতলের ঠিকানা নিই ছুঁকে।
টিন-বন্দী মাছের আঁশের গায়ে
কত না বোবা ঠোঁটের ভাষা আমি যে যাই পড়ে
আর তুমি,
পারবে কি তুমি বাজাতে নিশীথ-সুর
ড্রেন-পাইপকে বাঁশির মতন ধ'রে ?

ইতিহাসের জন্যে

যখন নির্বাচন হ'য়ে গেল
কার কোথায় স্থান
স্বর্গে কিংবা নরকে,
হিসেব-নিকেশ
হ'ল শেষ
সন্তের, চোরের,
সেই সন ১৯১৬—
মনে আছে ভালো—
ফিট্‌ফাট্‌ বাবু সব পিঠটান দিল
পেত্রোগ্রাদ থেকে।

ট্রাউজার পরা মেঘ

[অংশ]

প্রস্তাবনা

তোমাদের ভাবনা,
বেহেড মগজে কানাকানি
মোলায়েম আরামে ফাঁপানো-ফোলানো জো-হুকুমের মতো,
আমি হানব বিদ্রূপ রক্ত-ভেজা হৃদয়-টুকরো নিয়ে ;
আর মেটাব আমার উদ্ধত, তীব্র, জ্বালা-ধরে-ওঠা ঘৃণা ;

কোনো পাকাচুলের ডোরা-কাটা নেই আত্মায়
না পিতামহদের স্নেহ সদয়, সরম !
আমি নাড়া দিই জগৎ আমার প্রবল গলার স্বরে
আর হেঁটে যাই — দিব্য সুঠাম
বাইশ বছর বয়স ।

কোমল প্রাণ !
তোমরা বাজাও প্রেম মৃদু বেহালায়, তুচ্ছ ছড়ে
মোটামাথা হ'লে পেটাও তা দামামায়
তবু, পারো না যা, নিজেকে এমন উগরিয়ে ঢেলে দিতে
যেমন আমি — তো হ'য়ে গেছি শুধু দু'টি অনাবৃত ঠোঁট !

এসো, নিয়ে যাও পাঠ —
পরিপাটি যত গণমান্য শ্রীময় সংস্থার
সাজানো-কক্ষ বৈঠকখানা স্ফুট-অস্ফুট কথার !

তোমরাও, এসো, যারা নাড়োচাড়ো ঠোঁট যে রাঁধুনির
উল্টিয়ে পাতা কোনো পাক-প্রণালীর ।
যদি চাও
আমি ক্রোধে-ক্ষোভে ভরা যন্ত্রণাহত ঝড়

অথবা আকাশ যেমন ফেরায় রঙ
যদি চাও
আমি অনন্ত হব নমনীয় কোমলতা
মানুষ তো নয়, ট্রাউজার-পরা মেঘ !

পুষ্পিত-হওয়া অস্তিত্বের আমি দিই নি স্বীকার
আবার আমার গানেতে জোরালো রটাই
পুরুষ যেন বা হাসপাতালের দোমড়ানো শয্যা
আর, ব্যবহারজীর্ণ প্রবাল, নারী ।

(১)

ভেবেছ কি ম্যালেরিয়া আমাকে শেখাল প্রলাপ ?

এ যে ঘটেছিল
ওডেসায় ঘটেছিল ।

'আমি তো আসছি চারটেয়' মারিয়া বলেছিল ।

আট
নয়
দশ

তারপর সন্ধ্যা
জানলার থেকে পিছন ঘুরিয়ে দাঁড়ায়
আর ঝাঁপ দেয় রাত্রিতে ক্রূর ভয়াল
রুষ্ট ভ্রূকুটি
ডিসেম্বরের শীত
আমার জরাগ্রস্ত পিঠের আড়ালে
ঝাড়লণ্ঠন বাতিদানগুলো অট্টহাসিতে ফাটে এবং হ্রেষায়

এখন আমায় পারবেও না তো চিনতে

পেশি মাংসের স্ফীত এই সমাহার
গোঙায়
এবং মোচড়ায়
এমন একটা জড়পিণ্ড, সে কী চায় ?
পিণ্ড, তবুও আকাঙ্ক্ষা তার হাজার।

সত্তার কোনও বাছাবাছি কিছু নেই
ব্রোঞ্জে ঢালাই কে, বা কে তার
হৃদয়ে লোহার পাত।

রাত্রে সে শুধু কামনা করে, সে কামনা
সব কর্কশ, কোমলতা মুড়ে নিতে
নারীতে।

এবং তখন
প্রকাণ্ডতম,
আমি দাঁড়াই দেহ-কুঞ্জ জানলার ধারে,
আর আমার ভ্রূ গলায় শার্সির কাঁচ।
কী হবে কী, প্রেম না অ-প্রেম ?
এবং প্রেম যদি, সে কেমনতর, কেমন
প্রবল না ক্ষীণ ?
এ দেহ ধরবে প্রবল প্রেম ?

হয়তো তা হবে ছোট্টখাট্টো
বিনীত, ছোট্ট প্রেম ;
চলতি গাড়ির আওয়াজে যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে
আর, শুধু ঘোড়ায়-টানা ট্রামের ঘণ্টায় মানায়
আবার ও পুনর্বার
বৃষ্টিতে নাক ঘষে
আমার মুখ তার মুখের ওপর পিষ্ট,

আমি অপেক্ষা করি
নগরীর বজ্রপাত বর্ষণের কাদায়, ছিটায়

তারপর মধ্যরাত্রি আসে ছুরি শানিয়ে,
ধরে ফেলে
ছেঁটে দাও, ছেঁটে দাও তাকে
নিপাত করো !

বারোটার ঘণ্টা পড়ল
ধড় থেকে ছিটকানো কাটা মুণ্ডের মতো

জানলার শার্সিতে ধূসর বৃষ্টিকণা
একসঙ্গে জুড়ল চিৎকার
কঠিন মুখবিকারে
যেন নতরদমের সমস্ত গর্গইল
একসঙ্গে জুড়ল চিৎকার

উচ্ছন্নে যাও !
যথেষ্ট নয় কি ?
চিৎকার এখনই আমার মুখের চোয়াল খুলে ধরে

তারপর আমি শুনলাম
আস্তে
একটা স্নায়ুর লাফিয়ে ওঠা
বিছানা থেকে রুগীর মতো,
তারপর প্রায় না নড়ে
প্রথমে,
দিল তা দ্রুত গা-ঝাড়া
উত্তেজিত
স্পষ্ট

এখন আরও কয়েক-জোড়া মিলে
তারা জুড়ে দিল বেপরোয়া নাচ

একতলার দেয়াল পলেস্তারা শব্দ ক'রে
খসে পড়ছে

স্নায়ু
গুরু স্নায়ু
লঘু
অনেক অনেক স্নায়ু !
মাতামাতি করতে থাকল
যতক্ষণ না
তাদের পাগুলো দুমড়ে যায় ।

কিন্তু রাত্রি চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে লাগল,
সারাটা ঘরে—
আর দু'চোখ ভারি হয়ে নেমে আসা, সেই কাদাজলে
থমকে দাঁড়াল

দরজাগুলো হঠাৎ জোরে শব্দ করে খুলে গেল, দমকা
যেন হোটেলের সমস্ত দাঁতগুলো ঝিকিয়ে
উঠছে আওয়াজ করে ।

তুমি ঢুকে পড়লে ঘরে আচম্বিতে
ভঙ্গি যেন 'গ্রহণ নয় বর্জন'
তোমার হাতের দস্তানা জোড়া মুচড়ে
তুমি বললে, যেন ঘোষণা :
'জানো
আমার বিয়ে'

ভালো, ভালো পরিণীতা হবে, হও
কী এমন তাতে
আমি তা গ্রহণ করতে পারি।
দ্যাখো, দ্যাখো, আমি শান্ত।
একটা মৃতদেহের
নাড়ির মতো।

মনে পড়ে
কেমন করে বলতে কথা?
'জ্যাক লণ্ডন
টাকাকড়ি
ভালোবাসা,
আবেগ!'

কিন্তু আমি দেখছিলাম শুধু এই .
তুমি গায়োকোণ্ডা
হরণ করে নেবার!

অপহৃত হ'য়ে গেলে তুমি

প্রেমে আমি আবার ধরব জুয়া
আমার যুগল ভ্রূর খিলান জ্বলে উঠবে।
কী আসবে কী যাবে।
হা-ঘরে ভবঘুরেরাও খুঁজে নেয়
আশ্রয় আগুন-লাগা পোড়ো বাড়িতে।

তুমি আমাকে করতে চাও পরিহাস?
'তোমার অমূল্য উন্মাদনার মুহূর্ত এতো কম
ভিক্ষুকের হাতের কোপেকেরও থেকে'

কিন্তু মনে রেখো
যখন উত্যক্ত করেছিল তারা ভিসুভিয়াসকে
ধ্বংস হ'য়েছিল পম্পেই !

শোনো,
ভদ্রমহোদয়গণ !
শৌখিন
অপবিত্রকারী
অপরাধের
আর হত্যার,
দেখেছ কি তোমরা
ভয়ঙ্করের ভয়ঙ্কর
আমার মুখ
যখন
আমি
চরম শান্ত ?

আমি অনুভব করি
আমার 'আমি'
আমাকে ধরবার পক্ষে এতো অপরিসর
অদম্যভাবে বেরিয়ে আসতে চায় একটি দেহ
আমার থেকে।

বলো।
কে বলছো কথা ?
মা
মাগো !
ছেলের তোমার ভীষণ মহিম্ন অসুখ !
মা
হৃদয় তার তপ্ত-তাজা আগুনে,

বোলো তার বোনেদের, ল্যুদা আর ওল্যাকে
লুকোবার মতো নিভৃত কোণও নেই।

প্রত্যেক শব্দ
প্রতিটি পরিহাস
তার দগ্ধ মুখগহ্বর থেকে লাফিয়ে ওঠে
যেন বা উলঙ্গ বারনারী
আগুন-লাগা গণিকাপল্লীর থেকে

মানুষের নাকে লাগে
পোড়া মাংসের গন্ধ!
ব্রিগেডের লোকজন ধেয়ে আসে,
ঝক্‌মকে ব্রিগেড
উজ্জ্বল হেলমেট।
কিন্তু হাঁটু-ঢাকা বুট পায়ে নেই!

বলো দমকলের লোকেদের
যেন মমতা নিয়ে ওঠে যখন হৃদয়ে লেগেছে আগুন।

কিংবা আমাকেই দাও,
আমার চোখ থেকে আমি পাম্প করে তুলব অশ্রুজল
আমার পাঁজর ধরে এগোব
আমি লাফ দিয়ে উঠব! উঠব! উঠব!
সব ধ্বসে পড়ল,
কিন্তু হৃদয় থেকে কি লাফ দেওয়া যায়!

একটা অগ্নিভস্ম মুখের
ঠোঁটের চিড়-ফাটলের মধ্য থেকে
একটা দগ্ধ-চুম্বন উপরের দিকে-উঠে যেতে চায়

মা
আমি গাইতে পারি না
হৃদয়ের গীর্জায় গায়কদলের মঞ্চ জুড়ে আগুন।
শব্দ ও সংখ্যার ঝলসানো মূর্তিগুলো
খুলি থেকে পালাতে চাইছে
আগুন-লাগা বাড়ি থেকে শিশুদের মতো।
তেমনি, ত্রাস
আকাশকে ধরবার প্রয়াসে
উঁচু করে তুলল
লুসিতানিয়ার জ্বলন্ত বাহু।

একপ্রস্থ ঘরের নিরুদ্বেগের মধ্যে
যেখানে মানুষ কাঁপছে
বন্দর থেকে শতচক্ষু আগুনের ছটা এসে লাগে।

ক্রন্দিত হও,
যুগ যুগ শতাব্দী ব্যেপে
যদি পারো এক অন্তিম চিৎকারে ; অগ্নিদাহে আমি !

সম্মেলন-প্রসঙ্গে

[মায়াকোভ্‌স্কির এ কবিতাটি শ্লেষাত্মক। প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের ৫ মার্চ 'ইজভেস্তিয়া'য়। এই কবিতাটি লেনিনের চোখে পড়ে। পার্টি-ফ্রাকশনের এক বৈঠকে বক্তৃতাকালে মায়াকোভ্‌স্কির ওই কবিতাটির উল্লেখ তিনি করেন। লেনিন বলেন: "তাঁর কবিপ্রতিভার একজন বোদ্ধা বলে আমি নিজেকে গণ্য করি না…। কিন্তু বহুদিন পরে আমি এমন আনন্দ বোধ করতে পারলুম, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে। এ কবিতায় তিনি সম্মেলন নিয়ে পরিহাস করেছেন, কৌতুক করেছেন কমিউনিস্টদের নিয়ে, কারণ সব সময়েই তারা বৈঠক আর সম্মেলন নিয়েই ব্যস্ত। কবিতার ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু রাজনীতি, হ্যাঁ, আমি স্পষ্টই বলতে পারি যে, তিনি একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন।"]

রাত পোহাতে, হ'তে না হ'তে ভোর
সকলে যে যার দৌড় লাগায় কাজে,
কেউ যায় তার "সংস্থা"
কেউ "কম্পানি"'তে
"করপোরেশনে", "সমবায়ে" কেউ হাজিরা দিতে,
সকলেই দেখি দ্রুত উবে যায় পরম ব্যস্ত সাজে।

কাগজে কাজের বইছে দারুণ বন্যা
যেই না প্রবেশ আপিসে,
হাজার রকম, কোনটা যে বাছি—ভাবখানা
সবচেয়ে কিবা জরুরি!
তাইতো, এখন করা যায় কী যে—
সম্মেলনই ডাকো না বরং,
সমস্যা জমে ভারি!

এমন সময়ে ঢুকেছি একটা দরকারে:
"কার সঙ্গে এ কথাটা বলতে পারি?"

—শুধোলাম শেষে,
এক যুগ ধরে অপেক্ষা ক'রে ক'রে।

"কমরেড অমুকচন্দ্র অমুকরা তো গিয়েছেন বৈঠকে
পানীয় বিভাগে, জন-কমিশার ঘরে।"
হাজার গণ্ডা সিঁড়ি চেয়ে থাকে
আলো-আঁধারিতে ঢেকে।

আবার শুনছি :
"আসতে পারেন ঘণ্টাখানেক পরে—"
"এখন তো তাঁরা সম্মেলনে
দৈনিক কত কালি কেনা হবে
সে সমস্যারই সমাধানে…"

আরও একটা ঘণ্টা গেল কেটে।
কোনো কেরানী, এমনকি,
বেয়ারারও পাওয়া যায় না টিকি,
সকলেই
বয়সে তরুণ কিনা, তাই
গেছে চারতলায় চলে
যুব-লীগের বৈঠকে।

সারাদিনের পর সন্ধ্যা,
তারপর রাত্রি,
তখনও অধীর প্রতীক্ষা,
—অধম সাক্ষাৎ-প্রার্থী।
এক-দুই-তিন, কেবলই
তলার পর তলা
সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নামছি—উঠছি—নামছি
"কমরেড অমুকচন্দ্র অমুকরা কি ফিরেছেন?'

—"না, ওঁরা সম্মেলনেই আছেন

অ-আ-ক-খ-গ-ঘ-ঙ প্রমুখ

কমরেডবৃন্দের সঙ্গে···"

ধৈর্যের সব বাঁধ ভেঙে

শেষে

বৈঠকের ঘরেই একেবারে ঢুকে

ফেটে পড়ি

গলিত-লাভার মতো

মুখ দিয়ে বেরুতে থাকে ভাষা অকথ্য।

কিন্তু, এ কী!

বসে যারা ওখানে

তাদের তো দেখি—

নেই-ই

অর্ধেক শরীরই!

হা ঈশ্বর!

দেহের বাকি অঙ্গগুলো কোথায়, অতঃপর!

পাগলের মতো চিৎকার করি:

"খুন", "জঘন্য হত্যা",

গুম্ করা হয়েছে ওদের দেহের বাকি অর্ধেকটা!

এরকম কিম্ভুত দৃশ্যে,

মাথা ঘুরে যেতে বাধ্য এক নিমেষে।

কিন্তু,

নিতান্ত

শান্ত-স্বরে

একজন করণিকই জানান এবারে:

"ওঁরা একই সঙ্গে কিনা রয়েছেন, দু'জায়গায়—

দুটি সম্মেলনে বসে!"

"জানেন, বিশটি বৈঠকে
দৈনিক এমনই
যোগ দিতে হচ্ছে ওঁদের, প্রতিদিনই।
আরও কত জরুরি বৈঠক যে
নিছক বাদ দিতে হচ্ছে
সে সব তো হিসেবেই ধরিনি।
সেজন্য
নিজেদের নানা অংশে ভাগ করা ভিন্ন
গতি নেই অন্য…

"দেখুন,
এ ঘরে ধড়ের কোমর পর্যন্ত
ঠায় বসে করছে দেখাশোনা ;
আর ও-ঘরে,
দেখবেন মুণ্ডুগুলো টেবিলের চারধারে
বসে করছে গভীর তত্ত্ব-আলোচনা।"

ঘুমোতে পারি না। আমি ঘুমোতে পারি না।
থেকে থেকে আঁতকে উঠি শুধু
দেখে দুঃস্বপ্ন —
ভোর হ'লে
হাত-পা-শরীর সব অবশ, অবসন্ন ;
আর কিছু ভাবতে রাজিও নয়, মনও —
এই শুধু এই শুধু এই :
"হায়, তবু আর
যদি আরও
একটা সম্মেলনও ডাকা যেত,
সব সম্মেলন উৎখাত করার-ই একটা সম্মেলন…।

(১৯২২)

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

(অংশ)

সহসা

আলোড়িত

নগরী-পেত্রোগ্রাদ

শোনে :

ফিনল্যাণ্ড স্টেশন ছাড়িয়ে

ভিবর্গের শহরতলি দিয়ে

নেভা-নদী পার হ'য়ে

সাঁজোয়া গাড়ির এককোণে

তাঁর

শহরে ঢোকার সংবাদ।

আর,

আবার উঠল ঝড়।

ঘূর্ণিতে বিপ্লব-ঘূর্ণন :

"লেনিন আমাদেরই মধ্যে

দীর্ঘ হোক লেনিনের জীবন :

এই সে প্রথম

সচকিত এক

জনসমুদ্রে

আড়ম্বরের

হৈ-চৈ বিনা

উঠল জেগে

একদা যা ছিল

দুর্লভ তাই,

রুটিনের মতো

নিয়মমাফিক

একটি লক্ষ্য

সমাজতন্ত্র।

কল-কারখানা

ঘোরাচ্ছে চাকা

গর্জনে

পেরিয়ে যে সব,

পার হ'য়ে তার

আওয়াজ

দ্যাখ,

দেখা দেয় দিগন্তে

আদি-উত্থানে

আগামীদিনের স্বপ্ন

কমিউন

দু'চোখে আজ।

নেই বুর্জোয়া,

সর্বহারারা

প্রভু, কে দাস—

ভেঙে সব বাধা

প্রতিবন্ধক

জো-হুকুমদের,

ডাক এল ওই

লেনিনের গলা,

শানিত কুঠার

ওঠে ঝলসিয়ে,

জয়ধ্বনিতে

সায় সবায়ের :

"ঠিক লেনিন,

আজই এসেছে

কাজের দিন···"

বুভুক্ষার থাবা

পুঁজির জোয়াল,

যুদ্ধের দস্যুতা

হস্তক্ষেপের জাল ;

সময়ে মনে হবে সব
দুএকটা আঁচড়ের ক্ষত,
পিতামহী ইতিহাসের
চোখে না পড়ার মতো।
পিছনে তাকালে ফিরে
ভবিষ্যৎ থেকে
এ দিনের
অতিকায় মূর্তি এক
চোখে পড়বে
শুধু লেনিনের।
যুগ থেকে যুগে
দাসত্ব ডিঙিয়ে
পথ কেটে কেটে.
পৌঁছনো
কমিউনের যুগে
ক্ষুধা অনটন সব হেঁটে;
এসব দিনের কথা
ডুবে যাবে
সুদূর অতীতে,
জাগবে বসন্ত শুধু
কমিউনের
সারা পৃথিবীতে।
বিশাল রসাল ফল
উঠবে পেকে
টস্‌টসে বিপুল—
সে অঙ্কুর আজকেরই,
রক্তবর্ণ
অক্টোবর ফুল।
সেদিন
পড়তে গিয়ে

উত্তরাধিকার লেনিনের,

হলুদ পাতাকে

উল্টে

ধ'রে এ বইয়ের,

চোখ চেয়ে নামবে ধারা

উষ্ণ অশ্রু

বুকে ছিল জমা,

আবেগে বুজবে গলা—

মনে রেখ

সে কত দিনের।

খুঁজে দেখি

যদি আমি

কী আমার মহত্তম দিন—

যা দেখেছি

যা শুনেছি

যা পেয়েছি,

ওসব থেকে বড়—

তাহলে বলব আমি

তর্কাতীত

সংশয়বিহীন ;

সে ২৫শে অক্টোবর

—১৯১৭।[১]

স্মোলনি[২]

ভরপুর,

ফেটে পড়ে উৎসাহ—

গ্রেনেডগুলো

নাবিকদের গলায় ঝোলে

মালা,

খোলা-বেয়নেট

এদিক-ওদিক

যেন বিদ্যুৎদাহ,

মেশিনগানের গোলন্দাজের

কার্তুজ বেঁধে চলা।

করিডর-বারান্দা নয়

লক্ষ্যহীন পা ফেলার,

তাজা বোমা কি রাইফেল নয়

নাব'লোকের খেলার।

"কমরেড স্তালিন"[৩]

আপনাকে চান,

হুকুম নিন—

সাঁজোয়া গাড়িগুলি সব, যাবে

জেনারেল পোস্ট-অফিসে।"

"আর,

কমরেড ট্রট্স্কির নির্দেশ-এ।"[৪]

"বেশ"—

ফেলে পা-জোড়া

যে নাবিকটি

চলে গেল,

উর্দিতে তার লেখা :

"আরোরা"।[৫]

কেউ কেউ যাচ্ছে

কাগজের তাড়া ব'য়ে,

কেউ কেউ করছে যুক্তি,

আর কেউ সারছে

রাইফেল ঠিকঠাক,

করছে না কেউ

পুনরুক্তি।

এইখানে

নেই কোনও

সাজানো জাঁকজমক

সকলেই ব্যস্ত,

অনেকের মাঝে

এর মধ্যে কখন,

দ্রুত অথচ স্বাভাবিক

সেদিন ঢুকতেন—

তাঁর কাজে।…

আজ,

কোনো দপ্তরে অধিকর্তার

কিংবা লোকায়ত কারখানার

ঘুরন্ত লেনে,

আমরা জানি—

সর্বহারা

বিজয়ী যে।

আর,

জয়ের স্থপতি কে?

তাও জানি—

তিনি তো লেনিনই।

কমিণ্টার্ন[৬]

থেকে

কিংবা-কাস্তে-হাতুড়ি-মার্কা

নতুন কোপেকে

আমাদের

জয়গুলি

দ্বিগুণ-ত্রিগুণ,

তাও জানি—

সেই সবই

ইতিহাস পাতা জুড়ে লেখে—

লেনিনের দৃপ্তকাহিনী।…

এর মধ্যে

হঠাৎ

বজ্রাঘাত,

খবর :

ইলিচ

অসুস্থ

স্ট্রোক···

যদি

কখনও কোনো

স্মৃতিরক্ষণ-শালা

দেখাতে পারত

দ্রষ্টব্য :

বলশেভিকের অশ্রু ?

তাহলে হত সে

দিবারাত্রির ভিড়ে

মানুষের এক দেখার

বিরল-বস্তু ।

শত বছরের দুর্লভ দেখা

এমন অশ্রুপাত !

পাঁচটি তারার তীক্ষ্ণতা দিয়ে

আমাদের পিঠ ফোঁড়ে

হোয়াইট-গার্ড তস্কর,

আমাদের জলজ্যান্ত শরীর

গন্‌গনে আঁচে পোরে

জাপানি খুনীর ইঞ্জিন ঘর্ঘর,

মামোন্তভের দস্যুর দল[১]

বালিতে পুঁতে মাথা

ঠেলে পুরে দেয় জীবন্তে-কবর,

আমাদের মুখে

সিসে-ইস্পাত ঢেলে

বাক্‌রোধ করে দুশমন-বর্বর।

তারা যতো বলে—

"কবুল, নয়তো চলে যা নিপাত,

ততই কণ্ঠে অগ্নিগর্ভে বাজে :

"কমিউনিজম

অমর

জিন্দাবাদ।"

সারের পর সার,

স্তরের পর স্তর,

পেটানো লোহার,

গড়া ইস্পাতের—

জানুয়ারির বাইশ,

সপ্তম বছর

বসেছে কংগ্রেস

—সোভিয়েতের।

একে একে আসে

সদস্য-ডেপুটি,

বেশ হাসিখুশি

শুরু হতে বাকি…

কিসের তবুও দেরি ?

কেন এত লাগে খালি ?

পুরোও বসে নি দেখি

—সভাপতিমণ্ডলী।

কেন চোখমুখ

ভেলভেটের মত লাল,

কালিনিন—[৮]

তাঁর কি হয়েছে হাল !

কোনও অঘটন ?

কি হতে পারে তা ?

তবে, তবে—

তিনি ?

—শুধু স্তব্ধতা....

কড়ি-বরগা-ছাদ

নেমে আসছে

ঘাড়-গর্দানের ওপর

বাজপাখির ছোঁ-এর মতো :

মাথা কেন নিচু করছি,

নিচু করছি,

নিচু করছি কেন,—এত !

হঠাৎ

ভয়াল

আঁধার

নামল,

ঝাড়-লণ্ঠন থেকে

আলো

যেন খসে গেল !

একী !

পড়ল সভার ঘণ্টা—

কিন্তু,

ঘরের স্তব্ধতা

তার গলা টিপল বুঝি !

নিজেকে সামলে নিয়ে

কালিনিন ওঠেন, দাঁড়ান

চোখের জল তাঁর

মানছে না বাধা—

চিবুকে,

গালে,

সামনে,

পড়ছে সামনে,

ফোঁটা ফোঁটা,

কি করে থামান !

রাখা-ঢাকা নেই আর।

ফাঁকা—

সব সাদা।

ভাবনা হতবুদ্ধি

দেহ ক্ষীণ,

রক্ত উঠছে মাথায়।

শুধু,

তাঁর গলা কেঁপে যায় :

গতকাল

সন্ধ্যা ৬-৩০টায়

শেষনিশ্বাস নিয়েছেন

কমরেড লেনিন।[১]

দেখল সে বছর

এমন দৃশ্য,

যুগেও মিলবে না

তেমন দেখা।

হানল দিনগুলি

এমন আঘাত,

চিরটাকাল তা রইবে লেখা

বিভীষিকা—

লৌহ-হৃদয় নিঙড়ে

জাগাল আর্তনাদ—

বলশেভিকরা

পড়ল ভেঙে,

ফোঁপান কান্নায়

জীবন্ত বিষাদ।

একী ভার !

দেহও পারছি না বইতে, টানতে—
ঘটল কি করে !
কোথায় !
—চাইছি জানতে।
শবাচ্ছাদন
ওড়ে রাস্তায় গলিতে,
বলশয়, থিয়েটার
ভাসমান।
ইর্ষ—
শামুকের মতো বুকে হাঁটে
লোক—
দেখা দেয় ঝড়ের সমান।
সূর্য নেই
বরফ
বিবর্ণ হল।
খবরের কাগজ
নিকষ শিলপাতের মতোই
সব কিছু ঢেকে দিল কালো।
খবর দৌড়য়
শ্রমিকের কানে
কল-কারখানায়,
জ্বলন্ত গুলি
যেন মাথার খুলি
ভেদ করে যায়।
মেশিন-যন্ত্র-কলকব্জা
ডুবছে কান্নায়।
আর মানুষ
পাথরের মত যারা শক্ত,
ঠোঁট কামড়ে ধরে এমন—
ফেটে চোঁয়ায় রক্ত।

শিশু

এক মুহূর্তে

গম্ভীর, বয়স্ক,

বয়স্ক-প্রবীণ

শিশুর মত আকুল

কান্নার অধীন।

হাওয়া,

সারা পৃথিবী জুড়ে

বিনিদ্র যন্ত্রণায় ঘোরে,

বিদ্রোহী—

সেও মানতে চায় না তা—

মস্কোর

একটি শয্যায়

ঠাণ্ডায়

হিম কনকনে,

শেষ-নিদ্রায়,

শুয়ে

তিনি

বিপ্লবের সন্তান ও পিতা।

(১৯২৪)

রাত একটার ঘণ্টা পার হয়ে

একটার ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে, তুমি নিশ্চিত শয্যায়;
ছায়াপথ ছড়ায় রূপা রাত্রিতে।
আমার কোনো তাড়া নেই। ঘন ঘন তার
বার্তায় তোমায় জাগাব না, সে কারণ ফুরিয়েছে।
যেমন বললে, ঘটনাটি সমাপ্ত।
ভালোবাসার নৌকো দৈনিকের ধাক্কায় চুরমার।
এখন তুমি আর আমি বিমুক্ত। কী হবে তখন
নিক্তিতে মেপে পরস্পরের দুঃখ বেদনা, ক্ষত।
দেখো, বিশ্বভুবনে নেমেছে কী স্তব্ধতা শান্তি,
নক্ষত্রের উপাচারে রাত্রি অবারিত করে আকাশ।
এমন মুহূর্ত জেগে ওঠবার, সম্ভাষণের
যুগ, ইতিহাস আর সৃষ্টির উদ্দেশে

(১৯৩০)

ভোজবাজির পালা

আমাদের যুগ—১৯১৮'র বীরত্বব্যঞ্জক, মহাকাব্যিক, তির্যক এক রূপায়ন
(১৯২০—'২১-এর পরিমার্জিত)

জলপ্লাবনে পৃথিবী ধ্বংস হয়েছে। 'পরিচ্ছন্ন' (বুর্জোয়া) ও 'অপরিচ্ছন্ন' (সর্বহারা)—এই দু'জাতের কিছু প্রতিনিধি গিয়ে আশ্রয় উত্তর নিয়েছে মেরুতে। সেখানে বানানো হয়েছে একটা প্রকাণ্ড বজরা, যাতে নিরাপদে থাকা যায়। 'পরিচ্ছন্ন'রা একদা 'অপরিচ্ছন্ন'দের ধোঁকা দেওয়াতে, 'অপরিচ্ছন্ন'রা বিদ্রোহ করে ও বজরা থেকে তাদের ফেলে দেয় বাইরে। তারপর বিজয়ী হয়ে অপরিচ্ছন্ন'রা ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে নরকে এসে, নরকটা 'পরিচ্ছন্ন'দের থাকবার জন্যে দিয়ে যায়। তারা শাস্ত্র-বর্ণিত স্বর্গেও হাজির হয়। কিন্তু, সে জায়গটাকে অত্যন্ত আনন্দহীন, ক্ষুৎকাতর ও একঘেয়ে লাগতে ঘৃণাভরে

ছেড়ে চলে আসে আবার এই পৃথিবীতে। পৃথিবীটাকে ধ্বংসকাণ্ড, তছনছ ও অরাজক অবস্থা থেকে তারা আবার খেটে বানিয়ে তোলে এবং শেষে প্রবেশ করে প্রতিশ্রুত এক স্বপ্নের দেশে,—মর্ত্যের স্বর্গ কমিউনিজমের ভূমিতে।

শুরু হয় শেষ অঙ্ক, শেষের দৃশ্য :

দরজাগুলো সব খুলে যেতে ভেতরে একটা নগরী দেখতে পাওয়া যায়। কী আশ্চর্য মহানগরী। সারি সারি কলকারখানার উঁচু উঁচু চিমনি আর আকাশছোঁয়া নতুন নতুন সব ঘরবাড়ি। রামধনুর রঙে জড়ানো, সারি সারি রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি—যানবাহন। নগরীর মাঝখানে ঝলমলে আলোয় আলো মস্ত বাগান, সূর্য নক্ষত্র চাঁদ আলো দিচ্ছে। সুন্দর সাজানো অজস্র শো-কেস থেকে উঁকি দিয়ে চমৎকার সব জিনিসপত্ররা,—কাস্তে আর হাতুড়িকে সামনে নিয়ে অতিথি 'অপরিচ্ছন্ন'দের স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসে। অভ্যর্থনার জন্যে সঙ্গে করে রুটি আর নুনের (চিরাচরিত রুশী প্রথা, পাত্র নিয়ে এসে তাদের সামনে ধরে····

'অপরিচ্ছন্ন'রা : আহা-আহা-আঃ

জিনিসপত্র : হা! হা! হা! হা! হা।

ক্ষেতমজুর : কে তোমরা ?
কাদের তোমরা ?

জিনিসপত্র কাদের আবার, আমরা!

ক্ষেতমজুর নেই মালিকের নাম ?

জিনিসপত্র মালিক ?
এখানে, কথাটাই হারাম!
কারুরই আমরা নই,
আমরা আমাদেরই ;
হাতুড়ি আর কাস্তের
এসেছি প্রতিনিধি,—
স্বাগত জানাতে তোমাদের,
এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের।

ক্ষেতমজুর : তবু, এই রুটি কার জন্যে ?
এই লবণ ?

এমন মনোহর রুটি-মাখন
আজ আসছেন কি,
তোমাদের শাসন কর্তাটি ?

জিনিসপত্র : না হে, না—
বকছ কেন বাজে কথাবার্তা।
এইখানে যা দেখতে পাচ্ছ, সব-ই
তোমাদেরই তা।

ধোপানি : আমাদেরই ?
বলো কেন কথা মিছে ?
নই আমরা কচি কাঁচা
কি অন্ধ,
নিশ্চয়ই তোমাদের
ওরা করে বিক্রি
সেই যে যাদের বলে
মুনাফাখোর, ফাটকাবাজ-ই
তারাই দেখাচ্ছে আমাদের ধন্দ
নিশ্চয়, তারাই তোমাদের পিছে !

জিনিসপত্র : চেয়ে ছাখ, পেছনে
কেউ নেই—
ভুগছ মিথ্যে
সন্দেহেই।

বাবুর চাকর : আমি বাবুদের কারবার বুঝি, সব-ই
তোমাদের করবে গুদামজাত মাল, তারপর বছর
ঘুরলেই বেচে হবে লাল।

জিনিসপত্র : আর আমরা সে বান্দা নই
যে পচব গুদামে,
আর, তারা দর উঠিয়ে
বিকোবে চড়া দামে।
নিতে চাও
তোমরা নাও

যত খুশি

জেলে : তাহলে এখন,
দিতে হয় একটা আস্ত ঘুম
আর, দেখতে হয় স্বপ্ন
বেশি, বেশ-ই !

দর্জি-বৌ : একবার
আমি শুনতে গেছলাম
কি যেন একটা পালা গান,
বসেছিলাম পেছনের সারিতে ;
দেখি কি —
সামনে দেখান হচ্ছে
যাত্রায় রাজা বাদশারা
খুব কষে পানাহার করছেন সারা।
পালা ভেঙে গেলে,
আসরের বাইরে এসে
মনে হল কি —
আমাদের চারপাশটা
এতো বিচ্ছিরি !
শুধু ধুলো
শুধু কাদা

জিনিসপত্র : কিন্তু, এমনটা আর
নয় যে হবার
বদলেছে পৃথিবীটা।

কামার : আরে, রাখো এইসব
বোকামি !
পৃথিবীর কোনটা বদলেছে
শুনি ?
সেই ধুলো
আর কাদা,
সেই কালো

আর সাদা।

পেয়েছে খিদে তুলতে গেছ যেই মুখের গ্রাস

মোটাসোটা লোকটা এসে, অম্নি খপ্ ক'রে

ছিনিয়ে নিলে তোমার আশ্।

ধোপানি : (রুটির দিকে তাকিয়ে)

ইচ্ছে হয়—

এটাতে কামড় দি'

কিন্তু এই-ই আমাকে

কামড়ে দেবে :

লক্ষ রুবল হলফ করছি,

লক্ষ লোক এর দিকে তাকিয়ে

খিদেয় জ্বলছে—

রুটির কী !

রেল-মজুর : (যন্ত্রপাতির দিকে তাকিয়ে)

এরাও তাই,

আমাদের কাছ ঘেঁষে

গুটিগুটি

যেন নেংটি।

কিন্তু যেই না

কাছে যাই

অমনি বেরোয়

বেড়ালের নখ,

আমরাই

ব'নে যাই

কলে-পড়া

নেংটি ইঁদুর—

আমাদের আঁচড়ে কামড়েই

ওদের সুখ।

যন্ত্রপাতি : মাপ করো, মজুর ভাই,

মাপ করো।

তোমরাই আমাদের বানিয়েছ, চালিয়েছ,
করেছ দড়।
কিন্তু,
এলো ওরা,
নখে-দাঁতে
করল তাড়া—
আমাদের করল বন্দী-বান্দা।
হুকুম করলো—
"দিনরাত খাট্,
খেটে মর্ তোরা।
ইস্পাত, লোহা লক্কড়,
তোদের চিবুতে দি'
মানুষের হাড়—
আমাদের দে মুনাফা—
পাহাড়, পাহাড়!..."
ওরা সব পেটমোটা মালিক
খায় টাকাকড়ি আণ্ডিল, আণ্ডিল,
যন্ত্রপাতি হোক না বেঠিক,
মজুরের রক্তচোষে ঠিক,
মজুরের পেটে ধরে খিল।
মাপ করো, মজুর ভাই
মাপ করো,
এখন আমরা তোমাদেরই ভাই।
মালিকের ঘাড় ধ'রে
করেছি দেশছাড়া—
তোমরা যেমন চাও
আমাদের তেম্নি গড়ো।

চলেছে, কারখানা-কল, ঘুরছে চাকা
চলেছে ইঞ্জিন-গাড়ি, পেরিয়ে ক্ষেত-খামার

চলেছে চলেছেই দেশটা যেন ছুটে
পেয়েছে যেন সে ছুটির খুশিটাই।
রাত ও দিনে দিনের মতো আলো
যতই দিন যাবে ততই আলো তার
জ্বালাবে রোশনাই, ঘুরবে কাজে চাকা—
এখন তোমাদেরই আমরা, মজুর-ভাই!

জিনিসপত্র : আমরা, আমরাও তোমাদেরই
হাতের কলকব্জা
তৈরি তোমাদের হাতে
হাতুড়ি কি স্যুঁচ,
করাত, শাবল, কোদাল, বেলচা।
যখন ভোর হয়, সরিয়ে সবে রাত,
আঁধারকে সরিয়ে, কোনো দিকে না চেয়ে
আমরা খুঁজতে থাকি তোমাদেরই হাত।
এই হাতই তো সব কিছু গড়ে, কোনো কাজে হেলা না।
এসো, ধরো, আনন্দের স্বর্গটাকে গড়ো।
তুলে ধরো হাতুড়ি, যেন হাতের খেলনা।

খাবার-দাবার : আর আমরা, মানুষ যা খায় দায় সব, যা পান করে;
আমাদেরই দাবি ক'রে মজুরের যত না লড়াই, হারজিৎ,
রুটি ও খাবার ছাড়া মজুরের তাকৎ কোথায়,
আর চিনি, চিনি ছাড়া মুখমিষ্টি কার?
হাড়ভাঙা খেটে করে আমাদের কায়ক্লেশে যোগাড়
পায় না ছুঁতে আমাদের দর যখন আকাশে লাফায়।
কুকুরের মতো মুখ ভেঙচে আমরা যাই সরে,
তোমাদের ক্ষুধার্ত চোখ দোকানের শো-কেসে তাকায়
ওরা রাখে আমাদের থরে থরে সাজিয়ে,
তোমাদের অপমান করে।
এখন সেইসব গেছে পরগাছারা চুলোয়
তোমরা এসেছ নিতে তোমাদের যা জিৎ
পেট পুরে খাও ভাই সকলে আনন্দ ভাগ ক'রে।

যন্ত্রপাতি, জিনিসপত্র, খাবার-দাবার (ঐকতানের সুরে) :
নাও, যা তোমাদের
ভাই নাও,
নিয়ে যাও।
সকলেই কাজের মানুষ
সকলেই খিদের মানুষ,
নাও,
নিয়ে যাও—
দিগ্বিজয়ী তোমরা, মানুষ !

কামার : হয়তো
দিতে হবে আগেভাগে
কোনটা খাব, তার ফর্দ,
নয়তো,
খাবার হুকুম ওরা দেবেই না, হয়তো !
কিন্তু, দেবোই বা আমরা কী
আমরা এলুম তো এই-ই সবে
স্বর্গ থেকে,
নরককে পিছনে রেখে।

জিনিসপত্র : না, না, দরকার নেই কোনো হুকুম-টুকুমের
এখানে যা দেখছ সবই তো তোমাদের।

ক্ষেতমজুর : আমাদের চালটা কি
নিড়ানির চেয়ে চট্‌পট্‌, ধারালো—
এখন তাকে করতে পারিনা ভোঁতা,
খেয়ে বাঁচি কি খেয়েই মরি, যাই বলো,
তাড়াতাড়ি ভাই খাবার-দাবারের কাছে চলো।

(অপরিচ্ছন্নরা এগিয়ে গেল। ক্ষেত-মজুর একবার মাটিতে হাত ঠেকালো)

ক্ষেতমজুর : এই যে মাটি,
আমার দেশের
যেন মা-টিই।

মাথায় ঠেকাই।

সকলে (একসঙ্গে) : এসো, এসো সকলে

খাই-দাই আর গাই।

ওপরে একটা

প্রার্থনাও পাঠাই!

রুটিওলা (ছুতোরকে) : আরে, এটা চিনি,

আয়,

ভালো ক'রে চেটেনি।

ছুতোর : ভালো করে!

রুটিওলা : মিষ্টির মতোই লাগল রে।

মিষ্টিটা বেশ,

অনেকে : আয়, আমরা খেয়ে নি'

পেট পুরে।

ক্ষেতমজুর (বেশ বুঁদ হ'য়ে) :

কমরেড জিনিসপত্তর,

শোনো তোমাদের বলি দু'একটা কথা,

থেকো নিরুত্তর।

আমাদের আর ভয় নেই,

যখন যা দরকার

পাব সহজেই।

আমরা তোমাদের

ফলাবো, বানাবো,

তোমরাও আমাদের

দেবে থোবে সব ও।

যদি কোনো কর্তা ফের

আঁটে চক্রান্ত,

আমরা-তোমরা তার

করব চূড়ান্ত।

আমরাই হাত লাগাই,

তৈরি করি বাঁচি।

সকলে (সমস্বরে) : বাঁচি ! বাঁচি ! বাঁচি !

বণিক-মালিক : (ভিড় ঠেলে সামনে এসে)

আরে, আরে বলছ যা-তা, করছ কি ?

হও না একটু ঠাণ্ডা ।

পাইয়ে দিচ্ছে যে, দাম তো তার দেবে

যেটাও পাওনা-গণ্ডা ।

কামার : কে দিচ্ছে পাইয়ে ?

আমরাই সব বানাচ্ছি—

বাপু, এবার কাটো ।

তোমাদের দিন কাবার

এবার আমরাই উঠছি,

ভুগিয়েছ যথেষ্ট !

আমরা সবই জেনে নিয়েছি,

চালাতে গোটা রাজ্য-ও,

পথটা ছাড়ো,

সরো ।

(সকলে বণিক-মালিককে হঠিয়ে দেয় । অপরিচ্ছন্নরা জিনিসপত্রদের ডেকে বলে)

ক্ষেতমজুর : আমার লাগবে একটা কোদাল, বেলচা.

মাটি-কোপানোর জন্যে, হাতটা

নিস্‌পিস করছে তা !

কোদাল-বেলচা আমাদের নিয়ে যাও না !

দর্জি-বৌ : আমার লাগবে একটা সুঁই,

সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজে

ব'সে ব'সে

আঙুলটা যা টাটাচ্ছে !

সুঁচ : এটাও তোমায় চাচ্ছে ।

কামার : বেশ একটা জব্বর হাতুড়ি,

কাজে লাগবে ভারি ।

হাতুড়ি : এই-তো, এক-পায়ে তৈরি !

(অপরিচ্ছন্নরা জিনিসপত্র আর যন্ত্রপতি সবাই হাত ধরাধরি ক'রে, গোল হ'য়ে দাঁড়ায়, রোদ্দুরে বাগান ভ'রে গেছে।)

রেল-মজুর, ইঞ্জিন-ড্রাইভার (ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতির দিকে চেয়ে) :

আমি চাই তোমরা চলতে করো শুরু—

কী আর

দরকার থামবার!

ইঞ্জিন-যন্ত্রপাতি : না, না,

হাতলটা খালি

চালিয়ে দাও এবার!

(ইঞ্জিন-ড্রাইভার হাতলটা ঘুরিয়ে দেয়। চাকাগুলো ঘুরতে শুরু করে। অপরিচ্ছন্নরা খুশিতে ডগমগ হ'য়ে দ্যাখে।)

ইঞ্জিন-ড্রাইভার : কখনো দেখিনি এমন দুনিয়া

দেখিনিক', দেখিনিক'!

দু'চোখ ভ'রে দেখার দুনিয়া

দেখেছি তো, দেখেছি তো!

এখন সে যে,

সেজে এল।

পুরোনো দুনিয়াটা গেল,

বদলে রে বদলে,

নাকি ছুটে এল ধূমকেতু

আকাশের কোল ফেলে—

সঙ্গে ক'রে হাজার-হাজার

ছুটন্ত রেলগাড়ি!

কতো না দেখছি দেখার,

শুনছি চাকার গান তার-ই!

কেন আর

কাঁধে বই জোয়াল

বুড়ো বলদের মতো চাল!

বছরের পর বছরের পর

বছর

আমরা হয়েছি বলি।
বছরের পর বছরের পর
বছর
অপেক্ষায় থেকেছি কেবলি !
দেখিনিক চোখ চেয়ে
চারপাশে,
জগৎটা কিরকম
বদলে গেছে।

জীবনে ফিরেছে
এমন শ্রী,
আয়, জোয়ালটা টেনে
ফেলে দি'।
কেন যায়
লোকে দেখতে
জাদুঘর—
আজকেরই
কতো জাদু,
সুখ
থরেথর।
ওটা কি আকাশ, নীল
নাকি নীল রেশমীর চাদর !
আমাদেরই হাতে যদি
সব কিছু করবার মন্তর,
তবে কোন্ দরজা না
খুলে যাবে পর-পর—
দেখা দেবে রাজ্য এক,
চোখের ওপর।
পৃথিবীটার
আমরাই
গড়বার

রাজমিস্ত্রি

গ্রহ-নক্ষত্রের
আমরাই
ডেকরেটর,
আমাদেরই
হাতে ঘুরছে
সব-পেয়েছির দণ্ডটি
আমরাই
সেরা জাদুকর।
রোদ্দুরটাকে
আমরাই
বেঁধে নেব
উজ্জ্বল ঝাঁটায়
তারপর—
করব সব সাফ
আকাশটার এধার-ওধার
মেঘেদের
ঝেঁটিয়ে নিয়ে
ঘাড়ে ধ'রে বানাবো
—বিদ্যুৎ।
পৃথিবীর সব নদী বইয়ে দেব মিঠে জলে, মধুবৎ।
আকাশের
তারা জলজলে
নিয়ে খুলে
রাস্তায়-রাস্তায়
বসাবো নির্ঘাৎ।
খোঁড়ো! উপড়ে তোলো! করাত চালাও!
ছ্যাঁদা করে দাও!
সকলে চেঁচাও "হুররা"
সকলের জন্যে "হুররা"—

এমনি এক সমাজ-সংসার।
আজকে, এই সব
বুঝি পালাগান, থিয়েটার,
আর, কালকে,
হঁ্যা, কালকে
এই সবই, হয়ে যাবে সত্যি—
সবারই, চর্মচক্ষে দেখবার।
আমরা এসব জানি
ভালো করেই,
তোমাকেও বোঝাতে পারি
ভালো করে ;
তবে রোসো,
শুনে যাও, আছে—
খবর হে !
চলে এসো নাটঘর ছেড়ে
চলে এসো তুমি ও সকলে
খবর আছে, খবর আছে, খবর-ই,
আমাদের কাছে এসো চলে,
পরিচালক, অভিনেতা, কবি !
(সবাই, দর্শকরাও, গিয়ে মঞ্চে ওঠে)

সকলে : (সমস্বরে, ঐকতান)
এই সুন্দর গীর্জার সূর্য উপাসকরা
আমাদের মাটির স্বর্গের,
এসো ধরো, ধরি শুভ তান,
আমাদের স্তোত্র-গায়কদের
কণ্ঠে বাজে
ভবিষ্যতের গান।

(অপোসপন্থীদের একজন হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, এদিক-ওদিক তাকিয়ে আশ্চর্য, দেখে এক কমিউন। কী হচ্ছে বুঝতে পেরে টুপিটা খুলে নামায়।)

আপোসপন্থী : না,

উদ্যোগী মানুষের স্বর্গে স্থান নেই ;
এই সব বোকাসোকা উপোসীদেরও না,
আমাদের ভাগ্য সমাজতন্ত্রই—
আমাদের ভাগ্য সমাজতন্ত্রই—
আমিও বলিনি কি তা !

(অপরিচ্ছন্নদের ডেকে)

কমরেড, তোমরা গাইছ যে বড়ই খাপছাড়া—
গলায় সুর নেই শুধুই চেঁচামেচি
গানেতে লাগাবে তো প্রাণের কিছু সাড়া

(সে চট করে একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ে, আর হাত নেড়ে সঙ্গীত-পরিচালকের ভঙ্গি করে। কামার-ভাই আস্তে আস্তে তার পাশে যায়, কাঁধে টোকা মেরে তাকে সেখান থেকে নামিয়ে দেয়।

অপরিচ্ছন্নরা : (আবার জোরে গান শুরু হ'য়ে যায়)

লক্ষ কোটি শ্রমিক যে আমরা
ভেঙে ফেলেছি প্রাচীন বন্দিশালা
আর শৃংখল আমাদের পায়ে বাঁধা নেই
মুক্ত-স্বাধীন আজ মাথা তুলে আমরা
ধুলোর মতনই নির্যাতন ঝেড়ে ফেলে
গা-ঝাড়া দিয়েছি ছাখ সদলে-সবলে
রূপকথা হয়ে গেছে সত্যির সত্যি
আমাদের কমিউনে যোগ দাও সকলে

(কোরাস) :

জয়ধ্বনির এ আহ্বান
দুনিয়ার মানুষ ধরো গান
আন্তর্জাতিক সংহতি
দ্যাখ নতুন জন্মের সোপান

আমরা চাইনি তো স্বর্গীয় মুক্তি
না ঈশ্বর না শয়তান আমাদের কেউ না
আমরা শোষিতরা কাঁধে কাঁধ দিয়েছি
শ্রমিক-শ্রেণীর, আজ ক্ষমতার দিন না !
আমরা মেলাতে আসি বিশ্বকে কমিউনে।

শ্রমিকের ঐক্যেই দুনিয়ার মুক্তি
কে কোথায় নিতে চাও এই জয় ছিনিয়ে
এই জয় অপরূপ মানুষেরই জন্যে

(কোরাস): জয়ধ্বনির এ আহ্বান
দুনিয়ার মানুষ ধরো গান
আন্তর্জাতিক সংহতি
দ্যাখ নতুন জন্মের সোপান
অতীতের যন্ত্রণা জ্বালা সব হোক দূর
বুর্জোয়া শাসনটা করেছি তো ধ্বংস
পৃথিবী জড়িয়ে ধরি ধুলো-মাটি সুমধুর
ধুলো-মাটি মেহনতী মানুষের অংশ
আমরা সৈনিক তার কারখানা-ক্ষেত থেকে
উঠে আসি অগণ্য শহর-গাঁয়ের লোকে
গোটা এ জগৎটাই আমাদের, পুরোটাই,
ছিল যে কিছুই না, আজ সেই-ই সব, ভাই

(কোরাস): জয়ধ্বনির এ আহ্বান
দুনিয়ার মানুষ ধরো গান
আন্তর্জাতিক সংহতি
আন্তর্জাতিক সংহতি
দ্যাখ নতুন জন্মের সোপান।

[পর্দা নামবে]

শোন, শুনতে পাচ্ছো

শোন, শুনতে পাচ্ছো—
যখন আকাশে একটি একটি করে তারা ফুটে ওঠে,
নিশ্চয়ই কেউ না কেউ কোথাও,
সেই তারাগুলির জন্য অপেক্ষা করে, কেউ যে চায়
আরও একটু উজ্জ্বল হয়ে ফুটুক ওই তারা,
কেউ যে বলতে চায় মণিখণ্ড, ঝিকমিক করছে—

যখন মধ্যাহ্নের ধুলোর ঝড়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে,
যখন ঈশ্বরের কাছে চোখের জল এবং ভয়,
বড় বেশী দেরী হয়ে গেছে বুঝি, এবং ক্রন্দন
দিশেহারা দুহাত বাড়িয়ে চুম্বন করতে চায় সরিয়ে নেয়া

তার হাত,

গুমরে গুমরে বলতে চায়, না, ওই আকাশের তারাগুলি ছাড়া বৃথাই জীবন,

বাঁচা অসম্ভব—

একটি অত্যন্ত নক্ষত্র চাই—নাহলে
যতই শান্তিতে থাক না জীবন—যেন ফিসফিস করে বলে
অন্য কাহাকেও—
"তুমি ভালো আছো! সে কি—ভয় নেই,
ভীত নও। সব ঠিকঠাক আছে—"

তবে শোন।
ওই সব নক্ষত্র উদয়, আর উজ্জ্বলতা, সব জ্বলে
কারো জন্য, যে চায়, কামনা যে করতে পারে মনে,
তারই জন্য যার নেই অবিশ্বাস যে,
ওই বাড়িটার মাথায় ঊর্ধ্বাকাশে,
অন্তত থাকবে একটি তারা—উজ্জ্বলতা

নিশ্চিত সে আছে—

প্রত্যূষ

গোমড়া বৃষ্টি
তেরছা তাকায় — শুধায় কিছু —

স্টিল ছবিটা পেরিয়ে, খোলা আকাশে
ঝুলছে মুক্তির তারাগুলো,

হালকা বিছানো বিছানা একটি, আর
সেই বিছানায় ভর দিয়ে,
ফুটছে তারাগুলো —

যখন
রাস্তার আলোগুলো গ্যাসের মুকুট মাথায় জারদের
নিভে যেতে থাকে
তখন ওই অকিঞ্চিৎকর লড়াই
চোখে বড় বেঁধে, ঠিক যেমনটি
চৌমাথায় দাঁড়ানো বেশ্যাদের হাতে ফুলের স্তবক —

এবং নির্বিঘ্নে,
খুনসুটি করা হাসির তুবড়ী, যে হাস্য পরিহাস
পিছনে রেখে যায়, হলুদ গোলাপের অন্তরালে,
বিষাক্ত সজ্জা আঁকানো বাঁকানো —
কিন্তু ওই নির্বিঘ্নের পিছনে,
সন্ত্রস্ততা অতিক্রম করে যদি দেখা যায়,
তাহলে চোখের তৃপ্তি বা, অবশেষে
ক্রুশচিহ্নের ক্রীতদাস কষ্ট পায় অথচ উদাসীন —

বেশ্যাপাড়ার শবাধার,
অনেক জল ঘোলা করে।

নিক্ষিপ্ত হয় একটি জলন্ত ফুলদানির মধ্যে,
পাশে ওই
প্রাচ্যের প্রত্যুষ—

মেঘের কারসাজি

অনেক উঁচুতে
আকাশে
মেঘেরা উড়ে যায়—
ওরা চারজন
তোমাদের দলের কেউ নয়—
এক থেকে তিন ওদের
যেন বা পুরুষ মনে হয়,
চতুর্থজনকে
একটি উট—
তারপর,
ওরা চলতে শুরু করতেই,
পথে,
ওদের সংগে যোগ দেয়
পঞ্চমজন,
যে দৃশ্যে
সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে,
হাতি যেন ছুটছে
অন্য হাতির পিছনে,
যতক্ষণ না
বুঝিবা ষষ্ঠ জন
এসে তাদের ভয় দেখায়·
আর চকিতে সব মেঘ

বাতাসে মিলিয়ে যায়—
আর তাদের পিছনে ছোটে,
মেঘের গলায় শিকল পরিয়ে
সূর্য লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়
যেন একটি হলুদ জিরাফ—

আকাশছোঁয়া বাড়ির ক্রসসেকশন

আচ্ছা ধরা যাক
সবচেয়ে উচু আকাশছোঁয়া
নিউ ইয়র্কের বাড়িটি—
আশিরপদনখ তার
বিশ্লেষণ করা যাক—

দেখা যাবে পুরোন মান্ধাতা আমলের
ঘুপচি ঘুপচি কোটর ঘর
ইঁদুরের বাসযোগ্য শুধু—
একটি
দেহাতি শহর, থমকে আছে,

দোতালায়—
অলংকারের ব্যবসা
২৪ ঘণ্টা সদাসতর্কতার কামাই নেই,
কোলাপসিবল গেটে হরদম তালা আটকানো
হচ্ছে সংগে সংগে,
পুলিসম্যানরা, ধূসর পোশাকে নির্নিমেষ
দাড়িয়ে যেন ফিল্মস্টার ;
অন্যদের সম্পদ পাহারা দিতে দিতেই পোষা

কুকুরের মতনই তারা ম'রে যাবে,

চারতলায়
অফিসঘর,
লাভ আর ক্ষতির,
ব্লটিং পেপারে মোছা হয়
ক্রীতদাসের ঘাম,

পৃথিবী
যেন না ভুলতে পারে
যেন না ভুলতে পারে
কে মালিক—
দরজার সামনে
সোনার জলে স্তবক
"উইলিয়ম প্রাট"—

ছতলায়—
পোশাকের মধ্য থেকে টাকা বের করে
গুনে নিয়ে একজন
অতিপক্ক শ্রীমতী
শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে ভাবী বরের—
তার বুক
ওঠানো লেসের
মসৃণতা
সম্ভ্রম শানায়।
সে তার বগল চুলকে নেয়,
নির্ঘিন্নে ঝাঁটার মতন—

আটতলায়
একজন মিস্টার

খেলাধুলোর মাধ্যমে
শক্তি জুটিয়ে
মুখ গুঁজে গার্হস্থ কিচেনে ঝুঁকে পড়ে—
হয়ত আবিষ্কার করে
বিবাহিত সময়ের অসাড়তা,
বা তেমন কিছু,
সে তার
অর্ধাঙ্গিনীকে বেশ কড়কে দেয়।

এগারোতলায়—
সদ্য বিবাহিত এক দম্পতি শুয়ে বিছানায়,
স্বর্গের আশীর্বাদ তাদের মুখে
উপচে পড়ছে,
ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাঁরা ক্রমাগত পড়ে ফেলেছে
নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিজ্ঞাপনগুলি—
"আমাদের গাড়ি কিনুন
মাসিক টাকার কিস্তিতে—"

চৌদ্দ তলা—
কনফারেন্সে শেয়ারহোল্ডারদেয় ভিড়,
কোটি কোটি টাকা
ভাগাভাগি করে নিচ্ছে, আর
পরস্পর
পরস্পরের প্রতি বিষ নিক্ষেপ করছে—
কারখানার লাভ,
হ্যাম তৈরী করা
চিকাগোর কুকুরের মাংস দিয়ে—

একচল্লিশ তলা—
কনসার্টের একটি সুন্দরীর শয়নকক্ষের পাশে

চাবির ফুটোয় চোখ লাগিয়ে তীক্ষ্ণ নজর,
বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য প্রস্তুতি,
একজন হাফগেরস্ত
তার স্বামীকে হাতে নাতে ধরে ফেলার
জন্য তাক খুঁজছে;

বিছানায়—
একজন ফ্রিল্যান্সার শিল্পী
যে কেবল ন্যাংটো শরীরের ছবি আঁকতে ওস্তাদ
যে,
নব্বইতলায় ঝিমোচ্ছে,
আর মনে মনে ছক কাটছে,
বাড়িওয়ালার মেয়েটাকে
কি করে জপানো যায়—
আর সংগে সংগে,
বাড়িওয়ালাকে গছানো যায় একটা ছবি,

আর ছাদে,
টেবলক্লথ পাতা,
সাদা, অবিশ্বাস্য সাদা,
একাকী
সেই রেস্তোরাঁয়
প্রায় আকাশের কাছাকাছি
একজন নিগ্রো ঝাড়ুদার
ভুক্তাবশেষের বড় বড় টুকরো ভক্ষণে ব্যস্তসমস্ত,
যখন ইঁদুররা ছোট ছোট টুকরোগুলো
সাবাড় করছে—

এবং প্রচণ্ড একঘেয়েমির
মিশেল চোখে

আমি দেখতে থাকি নব্বইতলা বাড়িটার
খানাখন্দ, না পসন্দ আমার,
আসলে আমি
সাত হাজার মাইল এগিয়ে যাবার কথা
ভাবছিলাম,
ত দেখি,
সাত বছর পিছনে ঠেলে দিচ্ছে ওরা সকলেই -

সার্জেই ইসেনিন

তুমি চলে গেছ,
ওরা যেমন বলে থাকে,
অন্য পৃথিবীতে —
শূন্যতা·········
শূন্যতায় মিশে মিশে যায়,
যেখানে তারাদের সংঘাত।
সেখানে আহরণ করা নেই অর্থ,
মদ্যপানের কোন দোকান ;
একথায় বলা যায় —
সপ্রতিভ।
না ইসেনিন,
তোমাকে মুখ বেঁকাচ্ছি না আমরা,
আমার জিহ্বায় ক্ষার নেই,
আছে দমচাপা কষ্ট —
আমার চোখের সামনে বারবার চেহারার দৃষ্টি
তোমার কংকালসাড় চেহারার দৃষ্টি
ভেসে আসছে !
আর রক্তের ওই নদীচিহ্ন

তোমার হাতের ছিন্ন ধমনী থেকে যা প্রবাহিত,

থামো

একটু দাঁড়াও—
তুমি কি সুস্থ ভাবতে পারছো—
তুমি কি রাজী হবে,
তোমার নরম দুই গালে মৃত্যুর চুনাপাথরের
ছোপ ধরুক—
তুমি, হ্যাঁ, তোমাকে বলছি
যে তুমি টান মেরে ছুড়ে দিয়েছ এই সব হতচ্ছাড়া
ভাবনার দীনতাপ্রয়াস,
অন্য অনেকের চাইতে কত বেশী
কোনদিন যার তুলনা ছিল না,
তবে কেন—
কিসের জন্য—
কোন হিসেবই মিলছে না যে,
তোমার কঠিন সমালোচকরাও আমতা আমতা করছে,
কারণ,
তোমার অতীত, এবং তোমার বর্তমান,
মূলত তোমার শ্রেণী সচেতনতার প্রতি অবহেলা,
যার ফলে
আরোতর কড়া মদের শিকার হয়ে যায় সবাই,
অবশ্যই—
"সে কি তার বোহেমিয়ান
জীবন ত্যাগ করতে পেরেছে,
তার নিজস্ব গোষ্ঠির প্রয়োজনে, যারা তাকে প্রভাবিত করতে পারে,
না :—লড়াই করার জন্য যথেষ্ট সময়
কোথায় তার—'
কিন্তু ওই শ্রেণীর মানুষজন,

তুমি ভাবছ
মদের গ্লাসে তাদের তৃষ্ণা মেটায়-
ইয়া :—
ওই শ্রেণী
অবশ্যই মাইনের দিনে, সন্ধ্যাবেলায়
একটা মেয়েমানুষ অপছন্দ করে যে তা নয়।
আর, যদি তারা বুঝতে পারে,
কেউ লক্ষ্য রাখছে, চৌকির কেউ না কেউ,
তৃপ্ত হওয়ার জন্য অন্যতর
স্বাদ সে বেছে নিতে পারে,
যেমন কবিতাও—কত কবিতা লিখে ফেলতে পারে
গদ্যের মতন দ্রুততায়
(ভোরোনিন এর মতন দুঃসাহস এবং প্রস্তুত)···
কিন্তু যদি এই সব কোথাও ঘটে যেত,
আমি ভাবতাম
তোমারই কীর্তি এইসব —
তুমিই ছিন্ন করেছ তোমার কব্জির ধমনী,
দীর্ঘকাল আগে —
বরং আমি,
যদি সত্যিই জানতে চাও ত শোন,
মদের পেয়ালায় মৃত্যু বরণ করে নেব,
একঘেয়েমির মধ্যে মরে যাওয়ার চাইতে
অথবা একঘেয়ে হয়ে বেঁচে থাকতে,
কোনটা যে—বিষয়,
একঘেয়েমি —না হতাশা,
না তুমি
না তোমার ওই পেন্সিলকাটা ছুরিটা
বোঝাতে পারে —
হয়ত, কে জানে
যদি কিছুটা কালি অবশিষ্ট থাকত,

জীবনের লেখনীতে,
হয়ত কে জানে তাহলে
কব্জির ধমনী ছিন্ন করার প্রয়োজন
হত না তেমন—

আর যারা, অনুকরণকারীরা,
ক্রমাগত বলতে চায়—"এনকোর", "এনকোর",
"ফির দেখাও—"
অন্তত পথে এক ডজন লোক
ছুটবেই তোমার ওই রক্তক্ষরণের অভিনয়
করে দেখাতে—

কিন্তু শোন, শুনছ,
কেন বাড়াচ্ছো আত্মহত্যার হিসেব—
বরং বানাও না আরো কালি,
প্রয়োজন যার অনেক,
তার জিহ্বা, তালু দুটো এখন দৃঢ়বদ্ধ
দাঁতের দৃঢ়তায়—ফর এভার—

চিরাচরিত শব্দগুলি,
শুনতেও লজ্জা লাগে আজকাল
নিঃশ্বাসের অপচয় যেন,
আর ওই লোকজন,
যারা কথার বুনটে খুব দড়,
তারা হারাতে থাকে
একজন লোভী
তরুণ শিক্ষানবিশকে
মৃত্যুর শয্যায়।

এখন তারা,

অন্তিম যাত্রার সরঞ্জাম নিয়ে
উপস্থিত হচ্ছে।
কবিতার আবৃত্তি করে, ছন্দে
মৃত যে তার কবিতার চাইতে তেমন
কিছু রূপান্তর ছিল না,
আর কবরে পংক্তির চুপচাপ মাটির প্রক্ষেপণ,
আরো পংক্তি দিয়ে
দুর্বোধ্য এবং একঘেঁয়ে ক্লান্তিকর ভাষায় -

এই কি একজন কবির
উপযুক্ত অন্তিম স্মরণ—
এইভাবে পাওয়া,
সেই স্মরণস্তম্ভ যা তার উপযুক্ত সম্মান
যদিও তৈরী হয়নি এখনও, ছাঁচে ঢালা হয়নি মেটাল,
কিন্তু কোথায় সেই সব,
সেই ধ্বনিত ব্রোঞ্জের আর
দৃঢ় স্তবকের গ্রানাইট পাথর—
স্মৃতির পরিখা বেয়ে বহে যায়
ধুলো আর নিত্য আবর্জনা,
আর তার ওপরে,
স্থির হয় স্মৃতি আর উৎসর্গের
যাবতীয়—

তোমার নাম
অবহেলার সংগে উচ্চারিত হয়।
তোমার বলা কথাগুলি
এতোল বেতোল এলেবেলে
হারিয়ে যায়,
এখনও জন্মায় নি কোন একটি বার্চগাছের তলায়,
সে বুঝি মরে যাচ্ছে - এমন—

"না—ওঃ—না একটা কথাও নয়,
হে বন্ধু
না, একটাও শব্দ না—"
বাঃ
আর একটু কথা বলতে চেয়েছিলাম
আর একটু খোলামেলা,
ওই আত্মময় লিওনিড ভি লোহেনগ্রিনস্কির
সংগে মুখোমুখি—
হ্যাঁ আমি ওদের যাত্রাপথ আটকে দাঁড়াব
হাজারো বর্বরতার বজ্রধ্বনি নিয়ে—

"কি সাহস তোমার,
বিড় বিড় করে কবিতা আবৃত্তি করছ—অ্যাঁ।
গরু যেমন বিচালির জাবর কাটে তেমন—"

তখন ওদের কানে তালা ধরিয়ে দিয়ে
শিস দিয়ে, হু-উ-উ চীৎকার করে উল্লাসে,
বলে উঠব,
"তুমি বুড়ি মায়ের দলে,
তুমি বুড়ি ঠাকমা আমার,
তোমার দপদপ করা ভগবান আর দেবতারা—"

তাহলে ওইসব হতভাগা রাস্তার আবর্জনা
সব চুলোয় যাক—
পদের দামী জ্যাকেটটির স্কার্টের ফাঁপানো ফোলানো
প্রকাশ ছলকাতে ছলকাতে,
যাকনা পি এস কোগান মহাশয়।
হেলতে দুলতে তার বর্ণাঢ্য এধার ওধার—
সামনে দেখতে পাওয়া যা কিছু
সব কিছুকে ছিন্ন ভিন্ন করে তার

মোমমাখানো গোঁফের ছুঁচগুলো দিয়ে—
ওই সব এতোলে বেতোলে,
এখনও কমতি হয়নি আশেপাশে।
অনেক কিছুই তাই করার ছিল,
অতএব ত্বরা করুন, বন্ধু, ছুটে আসুন

দূর ছাই—
জীবনটা প্রথমে নতুন একটা ছাঁচে
ঢালাই করতে হবে।
নতুন তৈরী,
নতুন ধাঁচে,
আর তারপরই সংগীতের মূর্চ্ছনায় ভরিয়ে দিতে হবে.

আজকাল,
ওরা লেখাটেখার ব্যাপারে বেশ কঠিন যাহোক।

কিন্তু তুমি বলতো,
খঞ্জ যারা
দীন যারা,
যদি কিছু মনে না করো, বলোত,
পৃথিবীর ইতিহাসের কোন মহৎ শিল্পী
কোথায় কবে
এমন একটা পথ বেছে নিয়েছিল যে পথ
সহজ এবং অনায়াস—

বলো—
শব্দ কি সেই ঝংকার নয় যা
মানুষের শক্তিরই চারিত্রিক স্ফুরণ স্ফূর্তি,
এগিয়ে চলো—
সময় বিস্ফোরিত হয়ে উঠুক সম্মিলিত

গোলাবারুদের মতন—
পিছনে পড়ে থাক
অনেক পিছনে,
পুরোন দিনের স্মৃতি সব, যার বাতাসে
মাথার দু-একটি চুল শুধু উড়বে,
নড়বে চড়বে, বুনটের চেষ্টা করবে বৃথা।
নাঃ,
সেই সব পুরাতন তেমন প্রস্তুত ছিল না
আনন্দের সম্ভারে,
আমাদের পৃথিবীতে
আহ্লাদের সরঞ্জাম কম,
আনন্দ ছিনিয়ে নিয়ে আসি, আসুন
ওই ভবিষ্যৎ দিনের মুঠি থেকে।

তেমন কঠিন কাজ কিছু নয়
আমাদের মরে মরে যাওয়া,
আমি বলি,
জীবন তৈরী করা, আহা,
কঠিন, দ্বৈরথ আহ্বান।

কাগুজে বাঘ

(ভ্লাদিমির মায়কভ্স্কির অভিজ্ঞতা ,

একবার যদি এইসব গ্রহ তারকার নিয়ন্ত্রণভার
হাতে নিতে পারতাম তাহলে
আমাদের পৃথিবীকে থামিয়ে দিতাম সংগে, সংগে,
"শোন,

শুনতে পাচ্ছো কলম সরছে খসখস
ঝর্ণা কলম সহজ সাবলীল,
যেন
পৃথিবী অন্ধকারে ক্রমাগত দাঁত কিড়মিড়
করে চলছে—
মানুষের অহংকার
কমে যায়
কিন্তু কোনদিন কি কেউ ভুলতে পারে-
মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণকারিদের
একটি বিন্দুস্থল,
মানুষ ক্রমশ
অত্যন্ত কাগজপত্রের পাশে
একটেরে একটি দাগ হয়ে চলেছে,
সাংসারিক গর্তের মধ্যে মানুষ
ছায়াশরীরীর মতন চলাফেরা করে
প্রতিটি নাকের জন্য দশ স্কোয়ার ফিট জমি,
তবু কাগজে পড়ে পরিকল্পনার উচ্ছ্বাস,
অফিস পত্রের দুর্গপ্রাকার,
টেবিলের ওপরে ছিটকে ছড়িয়ে যায়,
অথবা সেরেফ নিশ্চিন্তে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে,
যতটা সম্ভব সন্তুষ্টির ভাব নিয়ে—

দোকানে দোকানে কাপড় কেনার
কি ভিড়, শাড়ি কেনার'
পায়ের জন্য গালোসের ব্যবস্থা নেই,
হাতের জন্য নেই গ্লাভস,
অথচ কাগজপত্রের জন্য রয়েছে নতুন বাস্কেট
—বাম্পার ক্রপ বলা যায়—

বেড়ানোর জন্যই টাকা দরকার,

কত টাকা আছে হে তোমার,
কোনদিন কি মাদ্রিদে গিয়েছিলে,
বাজী রাখতে পারি যাও নি,
তবুও কাগজপত্রের জন্যই,
যাতে ওরা সবাই ভ্রমণে যেতে পারে
তার জন্য ওরা একটা নতুন
জেনারেল পোস্ট অফিসই তৈরী
করে ফেলল,

একসময়ে গোদা পা ছিল
মাঝখানে পা নাচিয়ে নাচিয়ে
কেমন লিকলিকে হয়ে গেছে।
আদেশের ভারে মস্তিষ্কের ব্যাপারটাই উবে যাচ্ছে
অবশ্য অনুভব করছে না বিশেষ কেউ

মোটা পোর্টোমেণ্টো ফেটে
কাগজপত্তর ছড়িয়ে পড়ে,
হাঁ করে সাদা দাঁতের সেলাই,
খুব শীগগিরই লোকজনেরা দেখবে
পোর্টোমেণ্টোর মধ্যে বসবাস করার জন্য
ঢুকে পড়ছে—
আর ফ্ল্যাটবাড়িগুলোয় বাস করবে
কাগজপত্তর, সরকারী দস্তাবেজ,
দিব্যচোখেই দেখতে পাচ্ছি এইসব
অলীক কল্পনার ব্যাপার নয়,
কাগজের শিঙ্গা ফুঁকবে কাগুজে ভবিষ্যৎবাণী,

টেবিলে এসে বসবে
কাগজ পত্র
নৈশাহার করবে

টেবিলের তলায়
    দুমড়ে মুচড়ে শুয়ে থাকবে
        ম্যানিকিনরা—

আমি
    দাদার ব্যানারগুলোতে
        একটা ঝড়কে এনে ছেড়ে দেব,
দাঁত দিয়ে ছিঁড়ব কাগজপত্র
    আর তারস্বরে গোয়ারের মতন
        চীৎকার করতে থাকব,
"সর্বহারা তোমরা
    দরকার নেই এমন প্রত্যেকটি কাগজের টুকরো
শত্রুদের মতনই ঘেন্না করতে শেখো,
    নরকের মতনই পরিহার করে যাও"

ওডেসা বন্দরে কথোপকথন

মেঘের
    বাতাবরণ
        পশ্চিমের অস্তগামী সূর্যকে
আগাম দেয় ক্যানারী ফেদার—
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ছড়িয়ে যায়,
    দক্ষিণ রাত্রির কালো কুসুম।
আর চোখ পিটপিট করছে একজন
    অন্যজন উত্তর দেয় আলো ঝুলিয়ে,
কিসের সংকেত জানাচ্ছে ওরা—
    কপালের ভাঁজে ভাঁজে কসরৎ করি আমি
একটা লাল আলোয় ঝলকানি ওঠে,

ঝাপসা হয়
তারপর সবুজ হয়ে যায়—

সম্ভবত সে
আগামীকাল
আমার সংগে দেখা করতে চাইছে,
অথবা হবেও বা
ঈর্ষান্বিত হয়ে লিভার পচিয়ে ফেলছে,
কিংবা হয়ত
সে প্রশ্ন করছে
"রেড আভ্‌কাজিয়া
সেত আমি,
এই সমরতরী
এস এস সোভিয়েতদাঝস্তান—
একাকী দাঁড়িয়ে—
এর চাইতে পাগলামি আর কি হতে পারে,
এসো এখানে লক্ষ্মীটি—
তোমার হাতে হাত রাখতে দাও"

চুপ—নিস্তব্ধ,
তারপর আভ্‌কাজিয়া অবশেষে উত্তর দেয়,
"একাকী যাওয়া কি অসম্ভব,
তোমাকে ত একা চলাটা শিখতে হবে,
কারণ এখন আমি প্রেমে পড়েছি
আশিরপদনখ ওই মাস্তুল অবধি
ওই ধূসর
তিন চিমনিওয়ালা ক্রুজার
কমিনটার্নের"

"তোমরা মেয়েমানুষেরা সবাই

বেশ্যা ছাড়া আর কিছুই নও,
ওর মধ্যে যে কি দেখল মেয়েটি,
ওই বৃদ্ধ অকর্মার ঢেঁকির মধ্যে ” —

আবার সে সংকেত পাঠায়
চাপা চীৎকার, চিমনীর শব্দে,
“শোন, তোমরা কেউ,
কিছুটা তামাক পাঠাবে আমাদের,
বড় একঘেঁয়ে এখানে, এই জলযানে
সব সময়েই ভিজে আছি আমরা—
প্রায় হাতে পায়ে খিল ধরে যাওয়ার মতন,
অস্ত্রশস্ত্রে মরচে ধরে যাওয়ার মতন অবস্থা প্রায় ”

সারা পৃথিবীটা ঘুমোচ্ছে,
জ্বলন্ত ব্ল্যাক সি-র ছত্রছায়ায়,
আর এক দৈত্যাকার নীল ক্রন্দন
ওই ওডেসা বন্দরের জন্য —

আস্বাদ ভিন্ন হতে পারে

ঘোড়াটা
একটা উটকে দেখেছিল
আর খুক খুক করে খুব হেসেছিল -

“এত
দুবলা
বিচিত্র দর্শন ঘোড়া”—
উটটিও ছেড়ে কথা কয় না

"তুমি—ঘোড়া নাকি,
না নিশ্চয়ই,
হবে কোন বেঁটে বাটকুল
উটের বংশধর মাত্র"

আর ঈশ্বরই যিনি সবটুকু
সমান দেখতে পান
জানেন যে
ওরা দুজনেই
দুটি ভিন্নজাতের স্তন্যপায়ী জীব মাত্র

আমি ভালবাসি

(সাধারণত)

আমি লক্ষ্য করেছি পৃথিবীতে
জীব জন্মানো মাত্রই তাকে ভালবাসা
দেয়া হয়ে থাকে,
কিন্তু
একজনের বিষয় ব্যবসায়ের মধ্যেই
আয়
এবং অনেক কিছু,

হৃদয়ে কঠিন পাথুরে মাটির পলি পড়ে যায়,
যেখানে ভালবাসা গজিয়ে ওঠা কঠিন,
হৃদয় ত শরীরের মধ্যেকার কিছু—
বেশত শার্ট পরাই ছিল,
কে একজন মূর্খ এসে হাজির হয়েছিল
খোলা বোতাম নাকি তার আবিষ্কার

কলারে টলারে স্টার্চ দেয়া বেশ
ধাঁধা লাগিয়ে দেয়া যাবে

বয়স হচ্ছে বটে—
মহিলাটি প্রসাধনের আশ্রয়ে চলে যায়
আর পুরুষটি একটু গা গতর নাড়িয়ে বসে
তার জন্য বই ঘাঁটতে থাকে—
বড় দেরী হয়ে গেছে না,
চামড়ার টান টান ভাবটি সরে কোঁচকানো
বেরিয়ে আসে,
ভালবাসা নড়েচড়ে
পাশ ফেরে
তারপর টুক করে খসে যায়—

(শৈশবে)
জন্মের সময়ে সাধারণত লোকে যা যা পেয়ে থাকে
আমিও সেইসব পেয়েছিলাম,
কিন্তু তবু অন্য কারা
সব হিংসেয় জ্বলে যায়,
আমার রায়নে পালিয়ে চলে যাওয়া
শয়তানের মতন
রকবাজের মতন কেবল সময় কাটানো,
এবং মাতৃদেবীর বকুনি অহর্নিশ,
"হ্যাঁ, মরার দিকে ঠেলে দিচ্ছি মাকে"
পিতৃদেব—
"বেল্ট দিয়ে পেটালেই ঠিক থাকবে বদমাস"
কিন্তু
আমি কল্পনায় একটা মুদ্রা লোফালুফি করতে
করতে সৈনিকদের সংগে বাজি ধরি,
দেয়ালের নিচে বসে থাকি,

জুতো না থাক ত কি হল, ইস্ত্রি করা শার্ট,
এই দুর্ধর্ষ গরমে সেদ্ধ হতে হতে
সূর্যের দিকে সোজা একবার তাকিয়ে ছুটে যাই,
পেছিয়ে আসি
সামনে পেট বের করে দিই — এই খেলা
যতক্ষণ না ক্ষিদে পায়,
এই রোদ্দুরের মধ্যে কোন রহস্য রয়েছে —
"কখনও কুঁকড়ে যেতে দেখি না
রোদ্দুরকে,
ওর মুখটা দেখাই যায় না,
অথচ অনুভব করে ঠিকই, বোঝা যায়,
ঠিক ঠিক,
যেখানেই আমার জন্য দৃঢ় ডাক আসুক না কেন,
নদীতে
পর্বতে উপত্যকায় — যেন যুদ্ধের ডাক ক্রমাগত"

(কৈশোরে)
অঙ্ক, ব্যাকরণ আর সেই সব পড়াশুনা
কৈশোরে ব্যস্ততাবিষয়,
আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হ'ল
পাঁচ বছর পেরোতে না পেরোতেই,
জেলখানায় বসে
পড়াশুনা করা -
কবি ত তৈরী হয় ভিন্ন রকমের জীবনে,
শয়নকক্ষের প্রয়োজনে, লোকে পিঠ চাপড়ায়,
আদরের সময় কুঁকড়ে শুয়ে থাকে,
পোষা কুকুরের মত ছন্দমিলে
কার কি বা উপকার হয়
কে জানে,
আর আমি, আমাকে শেখানো হল

ভালবাসাতে বিউট্যারকির জেলখানা—
ওই বোলানার দৃশ্যপটের জন্য
আমার অনুশোচনা,
সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের দিকে তাকিয়ে
আমার দীর্ঘশ্বাস ?

নরকই বলা যায়,
১০৩ নম্বর সেলের চাবির ফোকর দিয়ে
তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভালবেসে
ফেলি বাইরের আণ্ডারটেকারদের —
সেতো রোজই সূর্যোদয় দেখতে পাচ্ছে.
তুমি অবশ্য ঠোঁট উল্টিয়ে বলতে পারো —
"কি হয় ওই মোটা চাবিওয়ালা
রোদ্দুর দিয়ে—"
আর আমি। আমার কাছে
কোন একটা সূঁচের মতন ফাঁক দিয়ে
এক কণা রোদ্দুর পেলে,
সমস্ত পৃথিবীটাই যেন পেয়ে যাওয়া —

(বিশ্ববিদ্যালয়ে)
তুমি ফ্রেঞ্চ ভাষা জানো
বিশেষ ধরনের খোঁজখবর, জ্ঞানগম্যি,
একটা বিষয়ে কথা বলে যেতে পারো অনর্গল —
ভালো,
তাই বলে যাও সকলের কাছে,
কিন্তু বলোত,
গান গাইতে পারো,
গৃহসম্পর্কিত সংগীতের মূর্চ্ছনা —
তুমি কি সেই ভাষা জানো
যে ভাষায় ট্রামগুলি শব্দ করে চলে চলে যায়-

মানুষজন
বড় হলেই
পাঠ্যবই, খাতাপত্রের জালে জড়ায় নিজেকে।
আমিও অ আ ক খ শিখেছিলাম,
সাইনবোর্ড দেখে দেখে,
প্রায় জোর করেই বলা যেতে পারে,
টিন আর লোহার পাত ওল্টাতে ওল্টাতে,
ওরা পৃথিবীকে শস্য আহরণ করার আর
গভীরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে
পড়ে ফেলতে চায়,
যেন একটা বাচ্চার খেলনা—
আমিও ভূগোল শিখেছি মাটিতে বসে
রাতের অন্ধকারে একটি বালকের কাছ থেকে,
বড় বড় ঘটনাগুলো ইলোভস্কি, ঐতিহাসিক জন যে
তার মাথার চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে—
"বারবারোসার দাড়ি
লাল ছিল না ধূসর"—
আমি থোড়াই ভাবি ওইসব রহস্যের কথা—
মস্কোর গালগল্পই
আমার ইতিহাস—
তারপর ধরুন দোব্রোলি উবভের কথা,
যা কিছু ভাল সব ভালবাসা
(শয়তানকে ঘৃণা করার চেয়ে বেশী), যাকে ওরা
খুব মেনে নিয়েছে, রাজারাজরারা সমাজের মাথা
সকলেই চীৎকার করে—"পাপী"।
আমিও ভুঁড়িওয়ালাদের ঘৃণা করেছি আজীবন
এমন যে ওদের খুন করতেও পারি
যে কোন সময়ে,
আমার একরাতের নৈশভোজের বিনিময়ে—
ঠিক মতন শিখে নিতে পারলে,

তুমি বসে থেকে
একজন মহিলাকে যথাযথ সম্মান জানাবে,
চিন্তা চিন্তাগুলো পুডিংভরা মাথা থেকে
ছিটকে পড়বে—
আর আমার সামনে
চাঁদমারি ওই বড় বড় বাড়িগুলো
পাম্পহাউসগুলোতে আঘাত করতেই আনন্দ—
ওরাও আগ্রহ নিয়ে শুনতে চাইবে
দ্রুত জেনে নিতে চাইবে,
আবহাওয়া নির্ভর জিহ্বাগুলোর
যাতে সাড় ভাঙে,
সেই সপ্তাহের গরম খবরগুলো
পরিবেশন করতে করতে।
(যৌবন)
হ্যাঁ, বড় হয়ে ওঠা একটা ব্যাপার বটে,
পকেট ভরতি টাকা,
ভালবাসা চাই না কি—
শুধু খরচ করো তা হলেই, একশো টাকা
কিংবা আরও একটু বেশী,
আর আমি
গৃহহীন হয়ে ঘুরে বেড়াই—
চোখ জলে।
হাত দুটো পকেটে ঢোকানো, ছেঁড়া পকেট
আর ফাঁকা—
সবচেয়ে দামী পোশাক আমার—
তোমাদের আত্মা শান্তি পায়,
স্ত্রীর কাছে, বিধবাদের কাছে.
রাত কাছে এলেই,
আর আমি
সারা মস্কো শহর জ্বলন্ত কয়লার মতন

আমি চাৎকার করে উঠি,
এইখানে—এইখানে, আমার হাত ধরো—
কোন গুণ্ডা লোহার মুঠি পকেটে ভরে রাখে যেমন,
ভিড়ে লেপটে যায়, বেপরোয়া,
কাদা আর জলের মধ্যেই
দ্রুতগতিতে ছুটে যায়,
পেটিকোটগুলো—
"আমরা না, আর একটু নরম, মনোরম
কিছু চাইছিলাম"—

বাঃ

তাই আমার ভার আমাকেই বহন করে যেতে হয়,
জানি সেটা নামিয়ে রাখতে হলে
তেমন খুশীও হব না নিশ্চয়,
না সেটা করছি না কিছুতেই,
যতই গলা ফেটে যাক, রক্ত ঝরুক
বুকের পাঁজর টুকরো হয়ে যাক,
কোরাস সংগীতে—

(তুমি)
ব্যবসার মতন কতকগা—
এদিক থেকে ওদিক থেকে উল্‌টে পাল্‌টে
আমাকে মেপে নাও ঠিকই—
বাচ্চা ছেলে—দূর
কোথাও হৃদয়টা পেয়েছে ঠিকই,
একটুও ম্লান হয়নি,
আর খেলতে লেগে গেছে-ছেলের
হাতে খেলনার মতন—
আর সবাই

যেন সাক্ষী থাকছে একটি বিস্ময়কর ঘটনার—
কুমারী এবং মেট্রনরা তাদের ভীতি স্পষ্টই বোঝা যায়,
"এই বাচ্চাকে ভালবাসা—আরে ওর ত শুধু রক্ত
আর বজ্রপাত সম্বল,
নিশ্চয়ই ভালুকের খেলা দেখাচ্ছে—কেমন ভয় পাচ্ছে না'
আর আমি
আমি বেশ মজা পাই,
আমার কাঁধে আর ভার নেই যেমন,
খুশীতে পাগল হয়ে যাই,
সদ্য বিবাহিত কালো আদমির মতনই
এত খুশী হই—এত হাল্কা লাগে নিজেকে—

(অসম্ভব)
একাকী,
পিয়ানো খুঁজে পাই একটি, বড় ভারী—
আর নিশ্চয়ই লোহার আলমারি একটি,
ওই আয়রণ সেফ আর পিয়ানো নিয়ে
কিভাবে, কোন ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায়
তোমার কাছ থেকে ফিরে পাওয়া হৃদয়কে
বহন করতে পারব আমি—
ব্যাংকের লোকজনেরা জানে
"আমাদের ধনদৌলতের শেষ নেই।
ফুপকেটে ভর্তি টাকা,
তাই আয়রন সেফ ব্যবহার করা নিরাপদ"—
লোহার সিন্দুকে তোমার জন্য আমার যে ভালবাসা তাই
হালকা লাগে—পাখির মতন উড়ে যাই।
কখনও
আহ্লাদ কমে যায়,
তখন হয়ত
একটু হাসি, অর্ধেক হাসি বা ওইরকম কিছু—

আমাকে পুড়িয়ে ফেলে,
মস্কোর রিং রোড এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে
সারা সন্ধ্যা-রাত,
তোমাদের প্রেমিকাদের হৃদয়ে শব্দ ওঠে
মৃদু নরম,
শয্যাসঙ্গীদের জন্য
যথেষ্ট আনন্দ এবং মুক্তি,
আর আমার জন্য
ক্যাপিটেলের হৃদয়শব্দের বিস্ফোরণ,
যখন আমি মস্কোর স্ত্রাসত্নায়া চৌমাথায়
ঘুরে বেড়াই –
খোলা বুকে,
হৃদয়কে প্রায় বাইরে এনে দুহাতে ধরে –
নোংরা জমা জল আর রৌদ্রালোকে
নিজেকে মেলে দিই আমি –
আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে আমার কণ্ঠস্বর,
ভালবাসা এবং কামনারা –
না,
আর আমি আমার হৃদয়কে বিশ্বাস করতে পারি ন
শাসনও না –
অন্যদের বেলায় জানি তাদের হৃদয়ের
শান্তি কোথায় –
বুকের মধ্যে সোয়েটারের ঠিক তলাটিতে
আর আমায়
আমার ওই পাগল শরীরের বোঁষে কোযে –
সব সময়ই ধুকপুক করছে।
বসন্তের সময়েই শুধু -
কুড়ির সবকটিই উপস্থিত সেখানে
সময়ের চাপে টৈটম্বুর
লাল গনগনে আমার মধ্যে –

ওদের দায়িত্বভার
জমে থাকে, খরচ হয় না,
তাই বড় বেশী ভারী হয়ে যায়,
আর আমার কষ্ট হয়
ভবিষ্যৎ ভালবাসার জন্য —

(ফলাফল)
কোন ভাবপ্রবণ লোকের চাইতেও বেশী সে স্বপ্ন দেখে,
কবির দুঃস্বপ্ন বহরে, ওজনেও,
হৃদয় ফুলে ফেঁপে দৈত্যাকার ধারণ করে,
ভালবাসায় দৈত্যাকায়, ঘৃণায় —
এত ভার যে আমার ডু'পা ভেঙে আসে —
আর, তুমি জানো, আমি কতটা শক্ত সমর্থ —
তবু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটি,
আমার হৃদয়ের বাড়ন্ত ভারবাহে,
তুকাঁধ এক গজ দূরত্বে ঝুঁকে আসে,
ছন্দের নির্যাসে টইটম্বুর — সেই রস
ছেনে নিতে পারি না ।
বেড়ে যায় — যেন ফেটে পড়বে — আরও জমে, হায়,
বিশ্বের সমস্ত কবিতা
আমাকে শুশ্রূষা করে —
আর আমার সামনে কেউ নেই, কিছু নেই ।
মোপাসাঁর কোন চরিত্রও না —

(আমার ডাকে)
ওহে, শুনছ — কেঁপে ওঠে ওরা,
দপদপ করে, পা ঠোকে মাটিতে
ঠিক যে ভাবে ধর্মঘটীরা মিটিং ডাকে ঘন ঘন,
কোথাও সাবধান বাণী বেজে উঠলে যার দৃষ্টিহীন
শিশু লাফিয়ে ওঠে —

ঝপ করে ছুরি বের করে—

মঙ্গলগ্রহে

মানুষের মতন হৃদয় নিয়ে যদি কেউ থেকে থাকে

সে ত নিশ্চয়

সারা জীবন ধরে কেবল পেন্সিলের শিসই ছুলছে.

আমার এই বিষয়টির

পরিণতি হবে হস্তপদহীন পঙ্গুর মতন।

যার দুকাঁধ ধরে,

দাঁতের ফাঁকে পেন্সিলটা গুঁজে দাও।

তারপর সামনে একটি নোটবুক রেখে

আদেশ কর—"লেখো"

সে উর্ধ্বাকাশে ঈগলের মতন ডানায় উড়ে যাবে—

নিচে ফেলে বুড়ি পৃথিবীকে

এই একটি বিষয় যেটি আসছে,

পিছনের দরোজায় কড়া নাড়বে,

উঁকি দেবে,

তারপর আবারও হারিয়ে যাবে ভূতের মতন—

দৈত্যের মতন বা বামন যেই হোক না কেন

তোমার ভাবনা চিন্তাগুলি কেমন এলোমেলো হয়ে যায়!

আর তুমি খাতাপত্রের সমুদ্রে ডুবে যাও,

এই একটি বিষয়

যা আসবে এবং দাবি করবে

"সত্যকে"—

এই একটি বিষয়

যা আসবে এবং আদেশ করবে

"সৌন্দর্য"—

এবং

ক্রুশবিদ্ধ হলেও

তুমি ভুলে যাও তোমার মায়া

ওয়ালট্জ নাচের ছন্দ

কিংবা ওইরকম কিছু

অন্যমনস্কভাবে যা গুনগুন কর —

এই বিষয়

তার নড়াচড়ায় অক্ষরগুলোকে

স্পর্শ করুক

একটা জিনিষ, মোটা, স্থূল যা

যে কোন মূর্খের মোটা মাথাতেও

ঢুকবে নিশ্চয়ই —

আর অ অক্ষরও

মেরুতুরঙ্গের মতনই দূর বহুদূরে

আর তোমার বিস্ফারিত চোখ—

শুতে পারো না ঘুমোতে পারো না।

এই একটি বিষয় যার

কোনদিন বয়সপ্রাপ্তি হয় না,

কোনদিন দৃষ্টির বাইরে চলে যায় না,

তাই, নির্বাক, যেন তুমি জানতেই,

তুমি লালরেশমের অগ্নিশিখা উর্দ্ধে উত্তোলিত

রাখার দণ্ডবাহক হয়ে যাও

অন্য অনেকের মতনই,

বেশ পুরোন কারুকায সম্বলিত বিষয়টি —

ঘটনা পরম্পরার মধ্যে ঝাঁপায়,

লাফ দিয়ে ওপরে তার কসরত করে —

ঠিক বুঝতে পেরে লুকোয় কখনো বা

তারপর

"কি করে ভুলতে পারবে"

দহন আমাদের আত্মাকে কুড়ে খায়,

চামড়ার 'ভিতরে ধমনী' খাতে

আর রাতভর বন্ধুদের সঙ্গে

পাগল আড্ডায়,

আর সঙ্গে দু-চারটে সদ্য লেখা কবিতা –

'আমারও একই অবস্থা'

জাহাজ-হ্যা জাহাজও একসময় তীরে ফিরে আসে.

ট্রেনগুলিও স্টেশনে এসে থামে,

আর আমি কেবল ক্রমাগত চলতেই থাকি,

আরও টান, তোমার দিকে শুদ্ধ শ্রদ্ধার টানে.

টান অনুভব করি –

ওর ভলটে পুশকিনের নাইটরা ঢুকে যায়.

মোমবাতির আলোয় ধনদৌলত পাহারা দেবে এখন.

আমি তাই ফিরে আসি তোমার কাছে, প্রিয়তম,

আমার হৃদয়ের

একান্ত স্ট্রংরুম – উপভোগ করি, ভালবাসি

মানুষজন গৃহে ফিরে আসে উল্লসিত.

সাবান আর ক্ষার দিয়ে বাইরের সমস্ত নোংরা

পরিষ্কার করে তারা,

আর তুমি – তুমিই আমার গৃহ,

আমি আসি,

আহ্লাদে আনন্দে কত কথা বলে ফেলি,

এক সুসময় আমাদের আজ

পৃথিবী হয়ত ফিরে আসছে পৃথিবীতে

জননী তাদের,

হ্যা – শেষ

হবে সেই যাত্রা পথ যে পথে হাঁটতে শুরু করেছিলাম

আমরা –

তাই তোমার দিকেই আমার এত টান,

আর কোনদিকে নয়,

যে মুহূর্তে চলে যাই,

যে মুহূর্তে বিচ্ছেদ হয় আমাদের

(সারাংশ)

দূরের হিসেব নয়,

কলহও আমাদের ভালবাসাকে

ম্লান করে দিতে পারে না,

পরীক্ষিত,

যদিও বাইরে—সারা সময়।

দু আঙুল ওপরে তুলে শপথ করি ছন্দে সুরে,

তোমাকে ভালবাসি,

সত্যি তুমি বিশ্বাস করতে পারো।

এটি

তার জন্য এবং আমার জন্য

এটি কি বিষয়ে

এই যে বিষয়

ব্যক্তিগত এবং সার্বজনিন,

আবহমান কাল গীত হয়ে চলেছে অতীতে

আমি লাট্টুর মত ঘুরি ফিরি

কাব্যিক গোলকধাঁধার মতন

আর এখন

আর একবার চরকির মতন

ঘুরতেই চাইছিলাম,

আজকের এই বিষয়

বৌদ্ধ প্রার্থনার সুরে বলা,

মালিকের ওপরে খুব বিরক্ত কালো আদমি একজন

তিনি

তখন টেলিফোন করছিলেন

টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে,

আমার গানের বিষয়

"তিনি এবং সে"

নতুন কিছু বিষয় নয় স্বীকার করতে দোষ নেই,

আরও বিসদৃশ ব্যাপার হল যে

তিনি এখানে আমি, আমাকে

নিয়ে লেখা,

এবং সে, তার সংগেই আমার সবকিছু –

কি সব বলছিলে যেন জেলখানার কথা।

ক্রিস্টমাসের উৎসব

সবাই আনন্দ করছে –

আলো বন্ধ করার

শিক নেই।

ওগুলো তোমার ব্যাপার নয় –

আরে এটাত জেলখানা –

কল নম্বরটা

তারের ভিতর দিয়ে

পাঠানো

একটি টেবিল –

পাশে

একটা খাট, পাটকরা বিছানা –

স্পর্শ করি শুনতে পাই.

ওইত টুকরো গুলো –

রিসিভার আমার হাত থেকে ছিটকে পরে

রিসিভারের ওপরে যে ট্রেডমার্ক, ভাঙা দুটো তীরচিহ্ন

একটার ওপরে আর একটা
চকচক করে,
আর বিদ্যুতের মতন মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ায়
টেলিফোন স্ট্যাণ্ড।
পাশের ঘর থেকে
আধ ঘুমন্ত
বিরক্ত প্রতিবাদ ওঠে—
"কোথা থেকে দুর্বল এই
আধগাঁইয়া ভূত,
এরপরে আরো কি করবে কে জানে"
ঘণ্টাধ্বনি আর্তনাদ
করেই চলে, পুড়ে যায়, পুড়ে যায়—
টেলিফোন সেটটা সাদা গনগনে তাতে ঝলকাচ্ছে—

সে অসুস্থ
মারা যাচ্ছে
যাও বাঁচাও ওকে
বেরোও,
তাড়াতাড়ি কর
হায় ভগবান
আমার শরীরের মাংস দিয়ে ভাপ বেরোচ্ছে
থামাতে পারছি না হিসহিস শব্দ—
সারা শরীরের পরম্পরায় বিদ্যুত চমকাচ্ছে
দশ লক্ষ ভোল্টের,
ওই জ্বলন্ত টেলিফোনে মুখ রাখতেই
ঘটনাগুলো ভয়ংকর হয়ে ওঠে সত্যি সত্যিই,
বাড়ি ঘরের
কাঠে, দরজা জানালায় ড্রিল করে
ফুটো করে
এদিক ঘেঁষে ওদিক ফুঁড়ে ইলেকট্রিক কেবল আনা

যেন গর্জন করে দাবি করে
"লাগামগুলো তাহলে ছেড়ে দাও—"
ওই বিষয়—
একদিন উত্তেজিত ছুটতে ছুটতে আমার
দরজায় চলে এসেছিল
আমার শুকিয়ে যাওয়া মগজ সম্পর্কে
কি যাচ্ছেতাই যে ইঙ্গিত করল,
এবং ক্রোধে
এদিক ছুঁড়ল ওদিক ছুঁড়ল, আমার বন্ধুবান্ধব,
করব এমন ঠিক করে রাখা কাজকর্ম ইত্যাদি সব—

ওই বিষয়টি
নিকটে আসতেই
অন্য সবই কেমন যেন দূর হয়ে গেল।
একা বিষয়টি, স্থির হয়ে,
যেন সব দায় দায়িত্ব নিয়ে
অবিভক্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল,
বলব কিবিষয়টি
ছিনতাইকারির মতন টুঁটি চেপে ধরেছিল আমার
কামারের মতন
ক্রমাগত হাতুড়ি ঠুকে যাচ্ছিল
বুক থেকে চিবুক অবধি—
ওই বিষয়
দিনের আলো পর্যন্ত আড়াল করেছিল
এবং বলেছিল
তোমার ছন্দগুলো নিয়েই আক্রমণ চালাও
চারদিকের এই অন্ধকার
ওপরের নিচের এবং সর্বত্রের
এই বিষয়টির নাম,
মহত্ত এবং মহান

জেল পাঠের গান

এই উজ্জ্বলতার
কিনারে
আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম
মনে আছে—
অতঃপর সেই উজ্জ্বলতার
নাম
দিয়েছিলাম কণতুষার—

আমার গান
আমার সর্বময়
গান

গানের নিয়ম রীতি
তরুণ তাজা হয় কদাচিত—
কিন্তু হৃদয় নিংড়ে
ব্যথা দিয়ে হৃদয়ে তীরবিদ্ধ
যে গান সৃষ্টি হয়
সেই গান তবু
গাওয়া যায়, তারুণ্যের সবুজে ঝকঝকে
সেই গান—

যে গলিতে, লুবিয়ানস্কি ড্রাইভ, আমি থাকি
ভোদোপাইনি লেন, যেখানে তুমি থাকো,
সেখানে কল্পনা করে নাও যদি পারো বিষয়টি,
সে তখন বিছানায় শায়িত,
জেগে আছে,

একতলা থেকে অন্য তলা — সব তলাতেই
বেলগুলি বেজে বেজে ওঠে
আর্তনাদ করে যেন,
কান বধির করে বেল বেজে উঠে
দেয়ালে ধাক্কা দিতে থাকে,
দেয়ালে ভেঙে যায় গুঁড়িয়ে যায়,
মেরামতের বাইরে,
তারপর আবার সেইসব নিরেট দেয়ালগুলো থেকে
লক্ষবার প্রতিধ্বনি ফেরে
ছড়িয়ে যায়,
বিছানার তলায় চেয়ারে —
সিলিং থেকে মেঝেতে
সেই দৈত্যাকার ঘণ্টা চুরমার হয়
আবার আবার
যেন একটা কিম্ভূতসদৃশ গোলাকার পিণ্ড
মুহুর্মুহু বদলে যাচ্ছে,
ওপরের দিকে ছুটে যায়,
ছাদ কার্নিশ ভেঙে নিচে পড়ে
জানলা দরজা, পর্দা,
বাসন পত্তর,
সব সেই ছত্রভঙ্গ দুমদাম হুড়মুড় করে
নড়ে চড়ে যায়
সবাই একযোগে,
বাড়ি কাঁপতে থাকে,
বাচ্চার দোলনার মতন,
ফোনের রিং রাগে গর্জন করতে থাকে

দ্বিতীয়

বিড়ালটা ঘুম ভেঙে লাফ দেয়,
ওর চোখ দুটো
লাল ভারী গালের মধ্য থেকে

তীক্ষ্ণভাবে দেখতে চেষ্টা করে,
রাঁধুনিটা চেষ্টা করে একবার
উঠে দাঁড়াতে, পড়ে যায়
ফোনে আমতা আমতা করে,
নাকিস্বরে বলে—
"কি বলছেন—ভ্যাদিন ভ্যাদিমিচ্ ?
কি বলছেন—"
অপ্রস্তুত প্রয়াসে শুদ্ধ করে কথা বলতে গিয়ে
ভাঙা আপেলের চেহারা নেয় ওর মুখ—
তারপর স্লিপার ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে
হেঁটে যায়—
যেন দ্বিতীয়বার গণত্তির মতন ওর যাওয়া,
পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায় দূরে,
একই রকম ভাবে,
আর সারা পৃথিবী
শূন্যতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়—
সেই অপরিচিত
একাকী
আমার দিকে টেলিফোন তাক করেছিল।

পৃথিবীর ঝাপসা
দূর হয়

সবকটি সভাতে, সমিতিতে, মিটিং-এ তুমি দেখবে
বক্তারা সর্বসময়ে অর্ধবাক্য
ঝুলিয়ে দেয় হাওয়ায়
কেমন একটা কাঁধ ঝাঁকানো ব্যাপার।
স্থির হয়ে গিয়ে,
এবং প্রায় আঁতকে ওঠার মতন
ওরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকে

নেয়ার পরই,

বুলেটের মতন নম্বরগুলি টেলিফোন গার্লের

কাছে পৌঁছে যায়—

মেয়েটির চোখ

সুইচবোর্ডের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে

পিটপিট করে,

কাল ছুটি—

তবু গাধার মতন খেটে যাওয়া—

তারপর

হঠাৎ একদিন

লাল আলোটি জ্বলতেই থাকে,

টিং-আ-লিং,

বেল বাজতেই থাকে,

আলোটা নিভে যায়—

আবার সহসা

আলোগুলি দপদপ পাগলের মতন

জ্বলতে থাকে দুলতে থাকে,

টেলিফোনের জালে

ধরা পড়ে—

"৬৭—১০"

"একটু নম্বরটা দিন ত"

"তাড়াতাড়ি"

"ভোদো পাইনি ?

হ্যালো—তুমি"

দুর—

বিদ্যুৎ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা নয়

আর ক্রিস্টমাস সন্ধ্যায়

ফুলে ফেঁপে ওঠাও—

টেলিফোন স্টেশনের সংগে তোমার,

-ওখানে বাস করতেন
এক বৃদ্ধ
মায়াস্নিটস্কি স্টিটে
(তোমার এবং আমার বাড়ির সংযোগপথটি)
কতকাল, যতদিন দেখছি ততদিনই,
নাতি নাতনি বয়সিদের যারা শুনতে চায় তাদের
হাজারো বার বলা একই গল্প বলে চলেছেন,
অদ্ভুত শোনাত সেই গল্প, সেই কণ্ঠস্বর—
"আমি তখন গিয়েছিলাম
শুয়োরের মাংস কিছুটা কিনতে
সস্তায় যদি পাওয়া যায়,
তখন বাজ পড়ার শব্দ মনে হল,
ভূমিকম্প,
না কি অন্যকিছু
খালি পায়ে দাঁড়ানো অসম্ভব ছিল
জুতোর সোলগুলো পুড়ে যাচ্ছিল।
মাটি এত গরম হয়ে উঠল"—

"বল বল দাদু,
হতেই পারে না তুমি জানো—
শীতকালে ভূমিকম্প—জেনারেল পোস্ট অফিসের মধ্যে
আশ্চর্য"

টেলিফোন লাইন
ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়

দৈবাৎ বলা যেতে পারে
চুলের মতন কর্ডের মধ্য দিয়ে
টেনে হিঁচড়ে সব নীরবতাকে ভেঙে চুরে
তছনছ করে
ফোনের রিং গর্জন করতে থাকে

বিসদৃশ ক্রিস্টমাসগুলির দিকে।
ওরা জীবনকে দেখতে অভ্যস্ত হয় কলহ
নয়তো বদনামের দৃষ্টিকোণ থেকে,
ওদের গৃহ,
ক্লান্তিহীন,
গোলমাল শাপশাপান্তে উন্মুখর,
অপেক্ষা করছে পার্থিব স্বৈরথের,
এখন
ওরা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে,
ওদের নিজস্ব চশমার কাঁচের মধ্য দিয়ে,
মোটর গাড়ির আওয়াজও
হার মানে
সব শব্দ থেমে যায়
আসমুদ্রহিমাচল অবধি।
শুধু পারস্পরিক ঝাগড়া বিদ্বেষ এবং
দ্রৌপদির শাড়ির মতন শেষহীন
ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সর্ব দুঃখহরণ মৃত্যুর শরীরে
যে সময় ডাক্তার, তাহাদের ছাড়া—মস্কো।

তার ওপারে
ঝুম স্থির কৃষিক্ষেত্র গুলি,
সাত সমুদ্দর
আর তার পিছনে নীল পর্বতমালা,
দূরবীন দিয়েইত দেখা
সারা বিশ্ব প্রকৃতি,
দৈত্যাকার আয়তনের বায়নাকুলার
(উল্টোদিকে থেকে দেখলে)
দিগন্ত কেমন সোজা দেখায়,
যেমন হয় উচ্চতা নিম্নতার নিরেখ,
একটা দড়ি,

টান টান বাঁধা
বীণাযন্ত্রে তার যেমন,
একটি টেলিফোন আমার ঘরে
যোগাযোগের সূত্র আমার
আর একটি টেলিফোনের—
তোমার সংগে
তোমার ঘরে।
মধ্যখানে
এমন মুখভঙ্গীমার সংগে
কোনদিন কল্পনাও করেনি
কবিতায়,
যেন নতুন শুভ্র আসবাবপত্রের
জন্যই অহংকার,
হাতির দাঁতের কাজ,
দিগন্ত বরাবর ওই মায়াস্মিৎস্কায়
ছেদ,
পরিচ্ছন্ন অত শুভ্রতার
অত্যাচার
আর অন্য সব কিছু
ক্ষুরস্থ ধারায় ঝুলছে
সেই ভ্রমণপথের শুভ্র বিছানো বিছানায়
শরীরে শিল্পীর খোদিত কারুকাজ—

দ্বৈরথ

এক,
ফোনটা তোলা হল,
যদি বা আশা ছিল
আর নেই,
দুই
টেলিফোনেক রিসিভার

নিখুঁৎ লক্ষ্যে স্থির রেখে
আমার ভ্রূসন্ধয়ের দিকে
সে মিনতি করে,
অনুযোগ করেও কিছুটা—
মনে হয়
চীৎকার করে উঠব ওই
লঘুগতি কুকুরের বাচ্চাটার দিকে,
তুমি জোরো চলতে পারো না।
দাণ্ডে যে পুশকিনকে দ্বৈরথে হত্যা করেছিল
তার মতন স্থির দাঁড়িয়ে থেকো না,
দ্রুত, হ্যা গুলি কর ওই ইলেকট্রিকের তারে—
কি হল, দ্বিধা কেন—
অন্ততপক্ষে
এই যন্ত্রণায় উপশম হবে কিছুটা,
বুলেটের চাইতেও মর্মান্তিক,
ওই কেব্‌লতারগুলি ফুঁসছে ফুলছে,
ডুবার হাইতোলার
মাঝামাঝি সময়ে
রাঁধুনিরা রেখে গিয়েছিল,
অজগরের পেটে একটা জ্যান্ত খরগোস যেমন
নড়াচড়া করে, ফুলে ওঠে—
সেইস্থান থেকে
আমার কাছে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে থাকে
একটি ভয়ংকর শব্দ,
এবং কথার চাইতেও বেশী ভয়ংকর,
আবহমানকাল থেকে
যখন পুরুষ নারীকে জয় করে নিত,
পেশীর জোরে,
আর ওই তারের মধ্য দিয়ে
ঈর্ষা গুটি গুটি পায়ে চলে আসছে,

গুহাবাসী জন্তু একটা,

ট্রাগ্লোডাইটা হবে একটা।

তবু—হয়ত······

হয়ত নয় নিশ্চয়ই

ওই তারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে কিছুই এমন

আমাকে বিপর্যস্ত করছে না ত,

না, কই কোথায় ট্রাগ্লোডাইটের

ক্রুর মুখভঙ্গী, নখ দাঁত,

আমি ত একাকী টেলিফোনে।

কালো ধাতুর চকচকে পালিশে

নিজের মুখ দেখছি—

ওইত সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সভা—

যাও সারকুলারগুলো ছড়িয়ে দাও,

কতটা সত্যি সেটাও ত বোঝা দরকার।

প্রথম জন্ম যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে,

উন্মাদ এবং অবিশ্বাস্য যন্ত্রণার,

একটি পশু বুদ্ধি বিবেচনা সত্ত্বেও

ধীরে ধীরে হেঁটে আসে।

বল—কি সুন্দর দৃশ্য—

কমরেড,

চেষ্টা করো গ্রহণ করতে

এই নির্মম সত্য—

আমি,

এবারের গ্রীষ্মকালে প্যারিসে যেতে হবে,

একজন কবি,

এবং ইজভেসতিয়া গণ্যমান্য সংবাদদাতাও বটে

জুতোর ভিতর থেকে থাবা দিয়ে

চেয়ারগুলো ছিঁড়ছি খুঁড়ছি,

এক ধাক্কায়

গতকালের মানুষ

ক্ষণাহীন

আর একটা ভাল্লুক,

সমপর্যায়ে আমি তাদের—

আমার পরিধান বস্ত্র জ্যাকেটের মধ্য দিয়ে

গজিয়ে ওঠে ঘন লোম,

ফোনে গর্জন করে উঠি—

আর কিছু না এটুকুই জানো শুধু,

সে কি,

মেরু অঞ্চলে যাচ্ছো বুঝি

সহযোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হতে,

হ্যাঃ—

একটা ভাল্লুক

তাড়িত

মৃত্যুর বলিকাঠে,

টেলিফোনটাকেই যেন আক্রমণ করি

যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এখন শত্রুতে পরিণত—

তার ততক্ষণ ওই

সর্বজনবিদিত বর্শা

এফোঁড় ওফোঁড় করে আমার হৃদয়,

মৃত্যুর পরোয়ানা শানায়

গভীরে আরো গভীরে—

ঢেলে দেয়

তামাটে আর লাল বর্ষণের ঢাল,

রক্ত আর গোঙানিতে ভর্তি হয়ে যায়

আমার অন্ধকার ঘরটি।

জানি না ঠিক,

ভালুকেরা আদৌ কাঁদে কি না,

তার যদি কাঁদার অভ্যাস থাকে তাদের

তাহলে নিশ্চয়ই ঠিক এইরকম ভাবেই

কেঁদে উঠত সেটি—

ঠিক তাই,

কেউত সান্ত্বনার ভাণ করেও

লক্ষ্য করবে ওকে,

সারা উপত্যকা জুড়ে ওরা দাপায়

হ্যা, ঠিক তাই,

তাদের ভালুক প্রতিবেশী বলশিন

জেগে ওঠেন,

দেয়ালের পিছনে দাঁড়িয়ে গাঁইগুঁই করতে থাকেন—

ঠিক ঠিক,

ভালুক বলেই ত আমার মনে হচ্ছে,

স্থির,

ওপরের দিকে ওল্টানো মুখ,

ওটা গর্জন করতে থাকে,

যেন নিজের ভিতরটা খুঁড়ে সে চিৎকার করে—

তারপর একটু সামলে নিয়ে

আবার কুড়িটি নখ নিয়ে সে

দেয়ালে আঁচড় কাটতে থাকে,

তারপর ক্লান্ত হয়ে স্নান করতে চলে যায়,

ও ভয় পেয়ে যায়,

ভাবে গুলির শব্দ

আকাশ ভেঙে

অঝোর ধারায় নামছে বুঝি—

হ্যা,

এ রকম স্বপ্নের ঘোর ভালুকের পক্ষেই

দেখা সম্ভব

চোখের জলে ঝাপসা, চর্বিতে ঠাসা

পিটপিট করা চোখে—

একটা বিছানা,

লোহার মোটা মোটা শিক,

পাতলা চাদর একখানা।

ভালুকটা লোহা জড়িয়েই শুতে যায়,
রুদ্ধবাক, অর্ধমৃত ভালুকটি,
লোহার মধ্যে কাঁপুনি সুরু হয়,
বিছানার চাদরে খচমচ শব্দ করতে করতে
আমি শুয়ে পড়ি,
ঠাণ্ডা জলে পা লাগতেই হিমশীতল
বুঝতে পারি,
জল—
সে কি—জল কোত্থেকে,
আর এতটা—
একি আমার কান্না,
চোখের জল—এত,
ছিঁচকাঁদুনে খোকা আমার,
মূর্খ কোথাকার—
অসম্ভব,
পৃথিবীর কেউ কেঁদে
এতটা জল জমিয়ে ফেলতে
পারে না,
ধুত্তোর স্নান করা,
সোফার পিছনেও এত জল—
টেবিলের তলায়
ওয়ার্ডরোবের তলায়
সোফার পিছন থেকে চুঁইয়ে আসে
যেন ঢেউ তুলে,
জানলা দিয়ে বাইরে চলে যায়
আমার স্যুটকেস ভাসিয়ে—
চিমনিতে, ফায়ার প্লেসে
একটু, শেষটুকু রয়েছে না—
আমি নিজেই ছুঁড়ে দিয়েছিলাম ওটুকু—
পা দিয়ে দাবিয়ে দিতে হবে,

ঝাচ্চোলে, উসকে উঠছে যে—

কি, কি বললে,

ফায়ার প্লেস—

না কোন ফায়ার প্লেস না ত—

বাঁচাও—

দূর—

কয়েক মাইল দূরের নদীতীর,

কেউ রাবণের চিতা জ্বালিয়েছে বুঝি—

সব ধুয়ে মুছে যাচ্ছে,

রান্নাঘরের বাঁধাকপির

গন্ধটুকুও—

টক হয়ে গেছে, পচে গেছে—

শূন্যতা,

শুধু একটি নদী—

দ্বিতীয় তীর—

লাডোগা থেকে

ঝিরঝির করে বাতাস

বহে আসে

দ্বিতীয় তীর,

আরো প্রশস্ততর, আরো

দূরে, বহু দূরে—

ঠাণ্ডায় ছাগলের চামড়ার মতন

কুঁচকে যায় নদী,

আমিও,

একটা সাদা ভালুক

মধ্য নদীর কোন বরফের চরায়—

কেউ নেই,

নিঃশব্দ,

সবাই কেমন শূন্য চোখ,
স্থির,
যে বরফচরাটায় রয়েছি,
এক সময় সেটা বালিশ ছিল।
তীর সরে সরে যায়
দূরে।
দৃশ্যের পরে কত দৃশ্য—
বাতাস গোঙাতে থাকে ক্রমশ
স্বর চরায়।
আর আমার বালিস ভেসে যেতে থাকে
সেই বাতাসের ঝড়ে,
খুব
জোরো ভাব,
আর বালিশের চরায়
আমি ভেসে যাই,
শুধু একটি অনুভূতি ভেসে যায় না,
—কোন কিছুর মধ্যে দিয়ে
আমাকে যেতে হবে,
কিসের
আমার বিছানা,
না কোন সেতুর নিচ দিয়ে,
চলতে পারি না,
অবশ্য এরকমটি আরো একবার
হয়েছিল আমার
দীর্ঘকাল আগে,
ভালুক হই বা না হই,
গর্জন করতে থাকি আমি,
আমি—বাতাস—আর এই নদী ?
না এই নদীটা নয়
এক দুই মুহূর্তে সংশয়ে দুলি আমি,

হ্যা,

মনে পড়ছে কেমন চকচক করত তখন,

ফিরে যাওয়া, ফিরে যাও,

হায়

নদীত কোন দাঁড় যোগায় না,

নিকটে, আরো নিকটে,

বুকের কাছটিতে আরো ঘনিষ্ঠতায়,

আবার সেই পুরোন দৃশ্য

ভেসে ওঠে,

সে জাহাজের ব্রীজে দাঁড়িয়ে, (আমিই ত)

কাছে আরো কাছে,

না ফিরে যাওয়া অসম্ভব এখন—

তাকে পারতেই হবে,

এইত সে উপস্থিত রয়েছে —

ওখানে.

ঢেউ তার লৌহপায়ে নেচে উঠছে,

স্থির,

ভয়ংকর এবং কি ভয়ংকর শক্তির

পরিধি,

শহরে,

হতাশার নির্মাণ

আমারই বিলাসচিন্তায়

একশো তলা বাড়ির ভিতের ওপরে

এটা দাঁড়িয়ে,

আর

টেরিলাইজড এমব্রয়ডারি আর

বাহারি পরিচ্ছদে

আকাশের সাম্রাজ্যে

ওই সেতুটি মাঝপথে

বাধা দেয়—
আমি চোখ ফেরাই
দূরে, আরো দূরে,
এখানে সেখানে,
লোহার রেলিং-এ ভর দিয়ে
সে ঝুঁকে দাঁড়ায়,
ধ্রুবতারা—
না, সে আমাকে
পিছনের দিকে ঠেলে দেয়।

দয়া আজ্ঞা হোক।
না—বাধা সরাবে না
সে কিছুতেই,
ওখানে,
ব্রীজের থামে শিকলে বাঁধা আমি,
আকাশের জ্বলন্ত পটভূমিতে
দাঁড়িয়ে আছে ওই লোকটি,
রুক্ষ ওড়া চুল,
কোনদিন কাটেনি মনে হয়,
আমি দুহাতে কান চাপা দিই—
বৃথাই—যথারীতি—
ওটা চলতেই থাকে,
আমার নিজের,
আমারই কথার প্রতিধ্বনি—
আমারই কথার তীক্ষ্ণ ধার,
থাবা ভেদ করে কানের পর্দা
ছিন্ন করে দেয়,
আমার নিজের কণ্ঠস্বর,
আমি শুনতে পাই
ভিক্ষা চাইছি,

ভ্‌লাদিমির,
থামো,
চলে যেও না আমাকে ছেড়ে—
তখন তবে কেন আমাকে
পালিয়ে যেতে দাও নি
দাও নি ভগ্ন হৃদয় হতে,
অবশ্যম্ভাবী পরিণতির মধ্যে—
তাহলে নির্ভার হওয়া যেত।
সাত বছর,
দীর্ঘ,
আমি এখানে দাঁড়িয়ে নদীর
দিকে তাকিয়ে বসে আছি,
ব্রীজের সংগে বাঁধা,
তোমার কবিতার তার দিয়ে বাঁধা—
দীর্ঘ সাতটি বছর
নদীর চোখদুটো আমার শরীর
ভেদ করে চলেছে,
আচ্ছা বলো ত,
আমার এখানকার মেয়াদ কবে
শেষ হবে—
সম্ভবত তুমি.
কৃমির মতন নিঃশব্দে ওদের জ্ঞানে
অনুপ্রবেশ করে চলেছ—
চুম্বন করতে করতে,
হেঁ হেঁ হাসিতে—
কব্জিতে বেশ শক্তি জমাতে জমাতে.
ও তাই বলো,
ওদের জীবনটা কেমন আস্বাদ করতে
সাধ তোমার—
তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি.—

চিন্তা নেই,

ওই রশ্মি ইঙ্গিত করে নি কি,

নির্মম,

নদীর অতল গর্ভে,

পালানোর কথাও ভেবো না,

আমিই তোমাকে ডেকে এনেছিলাম,

যেখানেই যাও,

খুঁজে বের করব ঠিকই,

তোমার মৃত্যু অবধি,—

এখন শহরে নিশ্চয়ই ছুটির পরব চলছে,

কোলাহল শুনেই বুঝতে পারি,

সুতরাং ওদের আসতে বলো,

উৎসব মিছিলের লোকজনদের,

সিটি সোভিয়েতের উচিৎ একটা

আইন পাশ করা,

যাতে সব বাজেয়াপ্ত করা যায়,

আমার এই অত্যাচার আরো বাড়ে,

যতক্ষণ না এই প্রশস্ত এবং গভীর নদী,

উদ্ধারকর্তাকে ভালোবাসতে পারে,

এসে

আমার শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়—

হ্যা তুমি,

তুমিও নিয়তিবদ্ধ, পালিয়ে

পালিয়ে যেতে,

তোমাকেও কেউ ভালবাসবে না হে,

কেবল পা চালিয়ে চালিয়ে

হুড়মুড় করে ভাঙো, ভেঙে পড়ো,

বাড়ি ঘর শুদ্ধ—

বাঁচাও—

থামো — হে বালিশ।

বৃথা যদিও —

আমার সব প্রচেষ্টা,

আমি আমার থাবা দিয়ে

প্যাডেল করতে থাকি,

ব্যর্থ দাঁড়,

নদী যেমন কে সেই আগের মতনই,

ভাটায়

আমার বরফ বালিশ চর

টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়।

ইতিমধ্যেই অনেকটা দূরে আমি,

আমার ছায়া থেকে বহুদূরে।

ব্রীজের রেলিং-এ —

তবু তার কণ্ঠস্বর —

সারা পথ —

আমাকে অনুসরণ করে চলে,

পালে

ফুলে ফুলে ওঠে দুর্যোগ,

:তোমার কি মনে হয়

ভুলতে পারবে

নদীর এই কলকল শব্দ —

অন্য কোন শ্রবণ দিয়ে

পারবে ভোলাতে,

চেষ্টা করে দেখো যদি পারো —

মৃত্যু অবধি তোমার স্মৃতিতে গাঁথা থাকবে,

"মানুষ" নামে

কবিতাটির গুঞ্জন কম্পন —

আমি চিৎকার সুরু করে দিই।

সেই আর্তনাদ থামাতে পারো —

কি ভয়ংকর ঝড় —

সেই ঝড়ের শব্দকে চাপা দিতে
পারো কি না দেখো,
কেউ একজন, বাঁচাও —
বাঁচাও —
বাঁচাও —
বাঁচাও —

ওইত ওখানে
ওই নদীর অলিন্দে
দাঁড়িয়ে রয়েছেন
একজন মানুষ